চতুর্বিংশতি অধ্যায়

রুদ্রগীত কীর্তন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

বিজিতাশ্বোঽধিরাজাসীৎপৃথুপুত্রঃ পৃথুশ্রবাঃ ।
যবীয়োভ্যোঽদদাৎকাষ্ঠা ভ্রাতৃভ্যো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **বিজিতাশ্বঃ**—বিজিতাশ্ব নামক; **অধিরাজা**—সম্রাট; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **পৃথু-পুত্রঃ**—পৃথু মহারাজের পুত্র; **পৃথু-শ্রবাঃ**—মহান কার্যের; **যবীয়োভ্যঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **কাষ্ঠাঃ**—বিভিন্ন দিক; **ভ্রাতৃভ্যঃ**—ভ্রাতাদের; **ভ্রাতৃ-বৎসলঃ**—ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—মহারাজ পৃথুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব, যিনি তাঁর পিতারই মতো যশস্বী ছিলেন, তিনি রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দিক আধিপত্য করতে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পৃথু মহারাজের জীবন ও চরিত্র বর্ণনা করার পর, মহর্ষি মৈত্রেয় পৃথু মহারাজের বংশ পরম্পরায় তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। পৃথু মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন, এবং তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দিক শাসন করেন। অনাদিকাল ধরে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার প্রথা চলে আসছে। পাণ্ডবেরা যখন পৃথিবী শাসন করছিলেন, তখন মহারাজ পাণ্ডুর

জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্রাট হয়েছিলেন, এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। তেমনই, বিজিতাশ্ব রাজপদে অভিষিক্ত হলে, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২

হর্যক্ষায়াদিশৎপ্রাচীং ধূম্রকেশায় দক্ষিণাম্ ।
প্রতীচীং বৃকসংজ্ঞায় তুর্যাং দ্রবিণসে বিভুঃ ॥ ২ ॥

হর্যক্ষায়—হর্যক্ষকে; **অদিশৎ**—প্রদান করেছিলেন; **প্রাচীম্**—পূর্ব দিক; **ধূম্রকেশায়**—ধূম্রকেশকে; **দক্ষিণাম্**—দক্ষিণ দিক; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম দিক; **বৃক-সংজ্ঞায়**—বৃক নামক ভ্রাতাকে; **তুর্যাম্**—উত্তর দিক; **দ্রবিণসে**—দ্রবিণ নামক অন্য ভ্রাতাকে; **বিভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

মহারাজ বিজিতাশ্ব তাঁর ভ্রাতা হর্যক্ষকে পৃথিবীর পূর্ব দিক, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃককে পশ্চিম দিক এবং দ্রবিণকে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৩

অন্তর্ধানগতিং শক্রাল্লব্ধ্বান্তর্ধানসংজ্ঞিতঃ ।
অপত্যত্রয়মাধত্ত শিখণ্ডিন্যাং সুসম্মতম্ ॥ ৩ ॥

অন্তর্ধান—অন্তর্হিত হওয়ার; **গতিম্**—বিদ্যা; **শক্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের থেকে; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অন্তর্ধান**—অন্তর্ধান নাম; **সংজ্ঞিতঃ**—নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপত্য**—সন্তান; **ত্রয়ম্**—তিনজন; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিলেন; **শিখণ্ডিন্যাম্**—তাঁর পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে; **সু-সম্মতম্**—সকলের দ্বারা সমাদৃত।

অনুবাদ

পূর্বে, মহারাজ বিজিতাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধানের ফলে, তাঁর কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্ধান উপাধি লাভ করেন। শিখণ্ডিনী নামক পত্নীর গর্ভে তিনি তিনটি অতি উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ বিজিতাশ্বের অন্তর্হিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল বলে তিনি অন্তর্ধান নামে পরিচিত হন। ইন্দ্র যখন পৃথু মহারাজের যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেছিলেন, তখন তিনি

ইন্দ্রের কাছ থেকে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র যখন অশ্ব অপহরণ করছিলেন, তখন তিনি অন্য সকলের কাছে অদৃশ্য ছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজের পুত্র বিজিতাশ্ব তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁর পিতার ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন জেনেও, বিজিতাশ্ব তাঁকে আক্রমণ করেননি। তা ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ বিজিতাশ্ব যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করতেন। ইন্দ্র যদিও তাঁর পিতার অশ্ব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তবুও বিজিতাশ্ব ভালভাবেই জানতেন যে, ইন্দ্র কোন সাধারণ চোর ছিলেন না। ইন্দ্র যেহেতু ছিলেন একজন মহান ও শক্তিশালী দেবতা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, তাই অন্যায়ভাবে আচরণ করলেও, বিজিতাশ্ব জেনে শুনে তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র সেই সময়ে বিজিতাশ্বের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হওয়ার মহান শক্তি রয়েছে, এবং বিজিতাশ্বের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁকে সেই যোগশক্তি দান করেছিলেন। তার ফলে বিজিতাশ্ব অন্তর্ধান নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা ।
বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥ ৪ ॥

পাবকঃ—পাবক নামক; **পবমানঃ**—পবমান নামক; **চ**—ও; **শুচিঃ**—শুচি নামক; **ইতি**—এইভাবে; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নিদেবতা; **পুরা**—পূর্বে; **বসিষ্ঠ**—মহর্ষি বসিষ্ঠ; **শাপাৎ**—অভিশাপের ফলে; **উৎপন্নাঃ**—সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **যোগ-গতিম্**—যোগ অভ্যাসের লক্ষ্য; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের তিনটি পুত্রের নাম ছিল—পাবক, পবমান ও শুচি। পূর্বে এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বসিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তাঁরা মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁরা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তাঁরা যোগবলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১-৪৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন যোগভ্রষ্ট হন, তখন তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং সেখানে জড় সুখভোগ করার পর, পুনরায় পৃথিবীতে অত্যন্ত ধনী পরিবারে অথবা পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

অতএব দেবতাদের যখন অধঃপতন হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁরা পৃথিবীতে অত্যন্ত ধনী ও পুণ্যবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে, জীব কৃষ্ণভক্তি সম্পাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং তার ফলে তাঁর বাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্রেরা ছিলেন অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, এবং তাঁরা যোগবলে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে, তাঁদের পূর্বের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

অন্তর্ধানো নভস্বত্যাং হবির্ধানমবিন্দত ।
য ইন্দ্রমশ্বহর্তারং বিদ্বানপি ন জঘ্নিবান্ ॥ ৫ ॥

অন্তর্ধানঃ—অন্তর্ধান নামক রাজা; **নভস্বত্যাম্**—তাঁর পত্নী নভস্বতীর গর্ভে; **হবির্ধানম্**—হবির্ধান নামক; **অবিন্দত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **অশ্ব-হর্তারম্**—যিনি তাঁর পিতার অশ্ব অপহরণ করছিলেন; **বিদ্বান্ অপি**—তা জানা সত্ত্বেও; **ন জঘ্নিবান্**—তাঁকে হত্যা করেননি।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের নভস্বতী নামক আর এক পত্নী ছিলেন, এবং তাঁর গর্ভে তিনি হবির্ধান নামক আর একটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহারাজ অন্তর্ধান যেহেতু ছিলেন অত্যন্ত উদার, তাই ইন্দ্র তাঁর পিতার যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করছেন জেনেও তিনি তাঁকে হত্যা করেননি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণ থেকে জানা যায় যে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র অপহরণ কার্যে অত্যন্ত দক্ষ। তিনি অদৃশ্য হয়ে যে-কোন বস্তু অপহরণ করতে পারেন, এবং তিনি সকলের অগোচরে অন্যের পত্নী অপহরণ করতে পারেন। একবার তিনি তাঁর অন্তর্ধান বিদ্যা ব্যবহার করে গৌতম মুনির পত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন, এবং তেমনভাবেই অদৃশ্য হয়ে তিনি পৃথু মহারাজের অশ্ব অপহরণ করেছিলেন। যদিও মানব-সমাজে এই প্রকার কার্য অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ইন্দ্রদেবের পক্ষে সেই কার্য গর্হিত বলে মনে করা হয় না। অন্তর্ধান যদিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পিতার অশ্ব অপহরণ করছেন, তবুও তিনি ইন্দ্রকে হত্যা করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে, অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি যদি কখনও কোন রকম নিন্দনীয় কার্য করেন, তা হলে তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

ভগবদ্‌গীতায় (৯/৩০) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

ভগবান বলেছেন যে, এমন কি কোন ভক্ত যদি কোন নিন্দনীয় কার্য করেন, তবুও, তাঁকে সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত, কারণ তিনি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ। ভগবানের ভক্ত কখনও জেনে শুনে পাপকর্ম করেন না, তবে পূর্বের অভ্যাসের বশে যদি কখনও কোন নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ ভগবদ্ভক্তরা স্বর্গলোকেই হোক অথবা এই লোকেই হোক অত্যন্ত শক্তিশালী। ঘটনাক্রমে তারা কেউ যদি কোন নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে, তা উপেক্ষা করা উচিত।

শ্লোক ৬

রাজ্ঞাং বৃত্তিং করাদানদণ্ডশুল্কাদিদারুণাম্ ।
মন্যমানো দীর্ঘসত্রব্যাজেন বিসসর্জ হ ॥ ৬ ॥

রাজ্ঞাম্—রাজার; **বৃত্তিম্**—জীবিকা; **কর**—কর; **আদান**—আদায় করা; **দণ্ড**—দণ্ড; **শুল্ক**—অর্থদণ্ড; **আদি**—ইত্যাদি; **দারুণাম্**—অত্যন্ত কঠোর; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকালব্যাপী; **সত্র**—যজ্ঞ; **ব্যাজেন**—অজুহাতে; **বিসসর্জ**—ত্যাগ করেছিলেন; **হ**—পূর্বে।

অনুবাদ

রাজার বৃত্তি অনুসারে, অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হত, দণ্ডদান করতে হত অথবা শুল্ক গ্রহণ করতে হত, তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তার ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, রাজা হওয়ার ফলে রাজাকে কখনও কখনও এমন কার্য করতে হয়, যা বাঞ্ছনীয় নয়। তেমনই অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কারণ যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়কে কর্তব্যের খাতিরে এই প্রকার অবাঞ্ছিত কার্য করতে হয়। প্রজাদের কাছ

থেকে কর সংগ্রহ করতে অথবা অপরাধীদের দণ্ড দিতে মহারাজ অন্তর্ধানের মোটেই ভাল লাগত না; তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার অজুহাতে তিনি অল্প বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

তত্রাপি হংসং পুরুষং পরমাত্মানমাত্মদৃক্ ।
যজংস্তল্লোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা ॥ ৭ ॥

তত্র অপি—তাঁর ব্যস্ততা সত্ত্বেও; **হংসম্**—যিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ দূর করেন; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **পরম-আত্মানম্**—পরম প্রিয় পরমাত্মা; **আত্ম-দৃক্**—যিনি আত্মাকে দর্শন করেছেন বা উপলব্ধি করেছেন; **যজন্**—আরাধনার দ্বারা; **তৎ-লোকতাম্**—সেই গ্রহলোক; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কুশলেন**—অনায়াসে; **সমাধিনা**—সর্বদা সমাধিস্থ হয়ে।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেও, আত্ম-তত্ত্ববেত্তা হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ অন্তর্ধান সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সাধারণত সকাম কর্মীরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাই এখানে *(তত্রাপি)* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ অন্তর্ধান বাহ্যিকভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হলেও তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। অর্থাৎ, তিনি সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা প্রচলিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন। সেই সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/২৩)

ভগবদ্ভক্তিকে বলা হয় *কীর্তন-যজ্ঞ,* এবং *সংকীর্তন যজ্ঞ* অনুশীলনের দ্বারা অনায়াসে সেই লোকে উন্নীত হওয়া যায়, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন। পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে ভগবানের লোকে ভগবানের সঙ্গে বাস করা, যাকে বলা হয় *সালোক্য* মুক্তি।

শ্লোক ৮

হবির্ধানাদ্ধবির্ধানী বিদুরাসূত ষট্ সুতান্ ।
বর্হিষদং গয়ং শুক্লং কৃষ্ণং সত্যং জিতব্রতম্ ॥ ৮ ॥

হবির্ধানাৎ—হবির্ধান থেকে; **হবির্ধানী**—হবির্ধানের পত্নী; **বিদুর**—হে বিদুর; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিল; **ষট্**—ছয়; **সুতান্**—পুত্র; **বর্হিষদম্**—বর্হিষৎ নামক; **গয়ম্**—গয় নামক; **শুক্লম্**—শুক্ল নামক; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ নামক; **সত্যম্**—সত্য নামক; **জিত-ব্রতম্**—জিতব্রত নামক।

অনুবাদ

মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধানী, যিনি বর্হিষৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক ছয়টি পুত্রের জন্মদান করেছিলেন।

শ্লোক ৯

বর্হিষৎ সুমহাভাগো হাবির্ধানিঃ প্রজাপতিঃ ।
ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাতো যোগেষু চ কুরূদ্বহ ॥ ৯ ॥

বর্হিষৎ—বর্হিষৎ নামক; **সু-মহা-ভাগঃ**—অত্যন্ত ভাগ্যবান; **হাবির্ধানিঃ**—হাবির্ধানি নামক; **প্রজা-পতিঃ**—প্রজাপতির পদ; **ক্রিয়া-কাণ্ডেষু**—সকাম কর্মের ব্যাপারে; **নিষ্ণাতঃ**—মগ্ন হয়ে; **যোগেষু**—হঠযোগের অভ্যাসে; **চ**—ও; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (বিদুর)।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! হবির্ধানের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন, এবং তিনি হঠযোগের অভ্যাসেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রভাবে, তিনি প্রজাপতিরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের সংখ্যা অধিক ছিল না, তাই সন্তান উৎপাদন করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য, অত্যন্ত শক্তিশালী জীব অথবা দেবতাদের প্রজাপতিরূপে

নিযুক্ত করা হয়েছিল। বহু প্রজাপতি রয়েছেন—ব্রহ্মা, দক্ষ এবং মনুও প্রজাপতিরূপে পরিচিত। হবির্ধানের পুত্র বর্হিষৎও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

শ্লোক ১০

যস্যেদং দেবযজনমনুযজ্ঞং বিতন্বতঃ ।
প্রাচীনাগ্রৈঃ কুশৈরাসীদাস্তৃতং বসুধাতলম্ ॥ ১০ ॥

যস্য—যাঁর; **ইদম্**—এই; **দেব-যজনম্**—যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে; **অনুযজ্ঞম্**—নিরন্তর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন; **বিতন্বতঃ**—সম্পাদন করে; **প্রাচীন-অগ্রৈঃ**— পূর্বমুখী রেখে; **কুশৈঃ**—কুশঘাস; **আসীৎ**—ছিলেন; **আস্তৃতম্**—বিক্ষিপ্ত; **বসুধা-তলম্**—পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্র।

অনুবাদ

মহারাজ বর্হিষৎ পৃথিবীর সর্বত্র বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার প্রভাবে পূর্বাগ্র-কুশ দ্বারা ধরণীতল আচ্ছাদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে (*ক্রিয়া-কাণ্ডেষু নিষ্ণাতঃ*), মহারাজ বর্হিষৎ কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ, একস্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পরই তিনি তার অতি নিকটেই আর একটি যজ্ঞ করতে শুরু করতেন। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার এই রকম আবশ্যকতা হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছে এবং দেখা গেছে যে, যেখানেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, সেখানেই হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে তাতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সূত্রে যে অচিন্ত্যনীয় কল্যাণ লাভ হয়, তা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত করা উচিত। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের কর্তব্য একের পর এক সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, যাতে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা পরিহাসের ছলেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারেই হোক, যেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তার ফলে তাঁদের হৃদয় নির্মল হবে। ভগবানের দিব্য নাম (*হরের্নাম*) এতই শক্তিশালী যে, তা পরিহাসছলে অথবা নিষ্ঠা সহকারে, যেভাবেই কীর্তন করা হোক না কেন, এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের প্রভাব সমভাবে বিতরিত হবে। বর্তমান যুগে মহারাজ

বর্হিষতের মতো একের পর এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব, কেননা তাতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন স্থানে বসে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করতে পারেন। যদি সারা পৃথিবী হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা প্লাবিত হয়, তা হলে সকলেই পরম সুখী হবে।

শ্লোক ১১

সামুদ্রীং দেবদেবোক্তামুপয়েমে শতদ্রুতিম্ ।
যাং বীক্ষ্য চারুসর্বাঙ্গীং কিশোরীং সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাম্ ।
পরিক্রমন্তীমুদ্বাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব ॥ ১১ ॥

সামুদ্রীম্—সমুদ্রের কন্যাকে; **দেব-দেব-উক্তাম্**—পরম দেবতা ব্রহ্মার উপদেশে; **উপয়েমে**—বিবাহ করেছিলেন; **শতদ্রুতিম্**—শতদ্রুতি নামক; **যাম্**—যাঁকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **চারু**—অত্যন্ত সুন্দর; **সর্ব-অঙ্গীম্**—দেহের প্রতিটি অঙ্গ; **কিশোরীম্**—যুবতী; **সুষ্ঠু**—পর্যাপ্ত পরিমাণে; **অলঙ্কৃতাম্**—অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিতা; **পরিক্রমন্তীম্**—পরিক্রমণ করার সময়; **উদ্বাহে**—বিবাহ অনুষ্ঠানে; **চকমে**—আকৃষ্ট হয়ে; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **শুকীম্**—শুকীকে; **ইব**—সদৃশ।

অনুবাদ

মহারাজ বর্হিষৎ, যিনি প্রাচীনবর্হি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি দেবদেব ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি ছিলেন নবযৌবন-সম্পন্না। সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে, বিবাহের সময় তিনি যখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি পূর্বে শুকীকে অভিলাষ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক প্রথা অনুসারে, বিবাহের সময় কন্যাকে মূল্যবান শাড়ি ও অলঙ্কারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভূষিত করা হয়, এবং বিবাহের সময় বধূ বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর বর-বধূর শুভদৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পরের প্রতি আজীবন আকৃষ্ট হয়। 'বরের কাছে বধূকে যখন অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে হয়, তখন সেই আকর্ষণ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা

হয়েছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং যখন তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন সেই আকর্ষণ অত্যন্ত দৃঢ় হয়। এইভাবে সুদৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয়ে বর সুন্দর গৃহস্থালি স্থাপন করে এবং অন্ন উৎপাদনের জন্য সুন্দর ক্ষেত্র তৈরি করে। তার পর সন্তান উৎপাদন হয়, তার পর বন্ধুবান্ধব আসে এবং ধনসম্পদ আসে। এইভাবে পুরুষেরা বৈষয়িক জীবনে জড়িয়ে পড়ে মনে করতে শুরু করে, "এটি আমার" এবং "আমি এই সব করছি।" এইভাবে সংসারের মোহ বাড়তে থাকে।

এই শ্লোকে *শুকীম্ ইব* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শতদ্রুতি যখন বর প্রাচীনবর্হিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, ঠিক যেভাবে তিনি পূর্বে সপ্তর্ষিপত্নী শুকীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অগ্নিদেব যখন সপ্তর্ষিদের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি ঠিক এইভাবে প্রদক্ষিণরতা শুকীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অগ্নিপত্নী স্বাহা তখন শুকীর রূপ ধারণ করে অগ্নিকে সম্ভোগ সুখ প্রদান করেন। কেবল অগ্নিদেবই নন, দেবরাজ ইন্দ্র, এমন কি ব্রহ্মা, শিব আদি অতি উন্নত স্তরের দেবতারা পর্যন্ত যৌন আবেদনের দ্বারা যে-কোন সময়ে অভিভূত হন। জীবের মৈথুন আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল যে, কেবল যৌন আকর্ষণের দ্বারাই সমস্ত জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এই যৌন আকর্ষণের ফলেই জীবকে জড় জগতে বদ্ধ হয়ে বিভিন্ন প্রকার শরীর গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী শ্লোকে এই যৌন আকর্ষণ আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

বিবুধাসুরগন্ধর্বমুনিসিদ্ধনরোরগাঃ ।
বিজিতাঃ সূর্যয়া দিক্ষু ক্বণয়ন্ত্যৈব নূপুরৈঃ ॥ ১২ ॥

বিবুধ—জ্ঞানবান; **অসুর**—অসুর; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্ব; **মুনি**—মহান ঋষিগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **নর**—ভূলোকবাসীগণ; **উরগাঃ**—নাগলোকবাসীগণ; **বিজিতাঃ**—মোহিত; **সূর্যয়া**—নব বধূর দ্বারা; **দিক্ষু**—সমস্ত দিকে; **ক্বণয়ন্ত্যা**—কিঙ্কিণী শব্দ; **এব**—কেবল; **নূপুরৈঃ**—তাঁর নূপুরের দ্বারা।

অনুবাদ

শতদ্রুতির বিবাহের সময় অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, নর ও নাগেরা অত্যন্ত মহান হলেও, সকলেই তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণী ধ্বনির দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণত মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হলে, সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর, তারা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সন্তানের জন্ম দেওয়া মেয়েদের স্বাভাবিক কার্য, এবং তাই একের পর এক সন্তান উৎপাদন করে তারা অধিক থেকে অধিকতর সুন্দরী হয়ে ওঠে। কিন্তু শতদ্রুতি এতই সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকৃষ্ট করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কেবল তাঁর নূপুরের ধ্বনির দ্বারা তিনি সমস্ত বিদ্বান ও মহান দেবতাদের আকৃষ্ট করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত দেবতারা পূর্ণরূপে তাঁর সৌন্দর্য দর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বস্ত্র ও আভরণের দ্বারা বিভূষিতা ছিলেন বলে, তাঁরা তা দেখতে পাননি। যেহেতু তাঁরা কেবল শতদ্রুতির পদযুগল দর্শন করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁরা নূপুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর পদচালনার সময় যার থেকে কিঙ্কিণী ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেবতারা কেবল তাঁর নূপুরের কিঙ্কিণীর ধ্বনিতেই মোহিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ণ সৌন্দর্য তাঁদের দেখতে হয়নি। কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ রমণীর হাতের চুড়ির অথবা পায়ের নূপুরের শব্দ শুনে, অথবা কেবল তার শাড়ি দেখে কামোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তা থেকে বোঝা যায় যে, নারী হচ্ছে মায়ার পূর্ণ প্রতিনিধি। বিশ্বামিত্র মুনি যদিও চক্ষু মুদ্রিত করে যোগসাধনা করছিলেন, তবুও মেনকার কঙ্কণের ধ্বনিতে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। এইভাবে বিশ্বামিত্র মুনি মেনকার সৌন্দর্যের শিকার হয়েছিলেন এবং তার ফলে বিশ্ববিশ্রুতা শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ, নারীর আকর্ষণ থেকে স্বর্গের দেবতা এবং উচ্চতর লোকের অধিবাসীরাও নিজেদের রক্ষা করতে পারেন না। ভগবানের ভক্তই কেবল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনি রমণীর আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন এই জগতের মায়াশক্তি আর তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

প্রাচীনবর্হিষঃ পুত্রাঃ শতদ্রুত্যাং দশাভবন্ ।
তুল্যনামব্রতাঃ সর্বে ধর্মস্নাতাঃ প্রচেতসঃ ॥ ১৩ ॥

প্রাচীনবর্হিষঃ—মহারাজ প্রাচীন বর্হির; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **শতদ্রুত্যাম্**—শতদ্রুতির গর্ভে; **দশ**—দশ; **অভবন্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **তুল্য**—সমানভাবে; **নাম**—নাম; **ব্রতাঃ**—ব্রত; **সর্বে**—সকলে; **ধর্ম**—ধর্ম; **স্নাতাঃ**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **প্রচেতসঃ**—তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা।

অনুবাদ

মহারাজ প্রাচীনবর্হি শতদ্রুতির গর্ভে দশটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই সমানভাবে ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁদের সকলেরই নাম ছিল প্রচেতা।

তাৎপর্য

ধর্মস্নাতাঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দশটি পুত্রই ধর্ম অনুষ্ঠানে মগ্ন ছিলেন। অধিকন্তু তাঁরা সকলে সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। মানুষকে তখনই সার্থক বলে মনে করা হয়, যখন তাঁরা পূর্ণরূপে ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানবান, ও সৎ চরিত্রবান হন। সমস্ত প্রচেতারা সমানরূপে সিদ্ধ ছিলেন।

শ্লোক ১৪

পিত্রাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে তপসেঽর্ণবমাবিশন্ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপসার্চংস্তপস্পতিম্ ॥ ১৪ ॥

পিত্রা—পিতার দ্বারা; **আদিষ্টাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজা-সর্গে**—সন্তান উৎপাদনের বিষয়ে; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **অর্ণবম্**—সমুদ্রে; **আবিশন্**—প্রবেশ করেছিলেন; **দশ-বর্ষ**—দশ বছর; **সহস্রাণি**—হাজার; **তপসা**—তাঁদের তপস্যার দ্বারা; **আর্চন্**—আরাধনা করেছিলেন; **তপঃ**—তপস্যার; **পতিম্**—প্রভুকে।

অনুবাদ

বিবাহ করে সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, প্রচেতারা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত তপস্যার পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মহান ঋষি ও তপস্বীরা এই পৃথিবীর সোরগোল থেকে দূরে নির্জন স্থানে বাস করার উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্বতে যান। কিন্তু, এখানে মনে হচ্ছে যে, নির্জন স্থানে তপস্যা করার জন্যই প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন। যেহেতু তাঁরা দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন, তাই এই ঘটনা ঘটেছিল সত্যযুগে, যখন মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। তাঁরা যে তপপতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য তপস্যা করেছিলেন, সেই বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। কেউ যদি জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য তপশ্চর্যা

করেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হতে হবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধ স্তর প্রাপ্ত হতে না পারে, তা হলে সমস্ত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন অর্থহীন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত সর্বোচ্চ ফল লাভ করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব-লোক-মহেশ্বরম্* । তাই তপস্যার বাঞ্ছিত ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

কেউ যদি মানব-সমাজের সব চাইতে নিকৃষ্ট চণ্ডালকুলেও জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি ধন্য, কারণ বুঝতে হবে যে, যাঁর জিহ্বাগ্রে ভগবানের নাম বিরাজ করে, তিনি তাঁর পূর্বজন্মে সব রকম তপস্যা অনুষ্ঠান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় যিনি মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) কীর্তন করেন, তিনি সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করবেন, যা পূর্বে মানুষেরা সমুদ্রে প্রবেশ করে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করার ফলে প্রাপ্ত হতেন। এই কলিযুগে, যদি কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সুযোগ গ্রহণ না করেন, যা এই যুগে অধঃপতিত মানুষদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন।

শ্লোক ১৫

যদুক্তং পথি দৃষ্টেন গিরিশেন প্রসীদতা ।
তদ্ধ্যায়ন্তো জপন্তশ্চ পূজয়ন্তশ্চ সংযতাঃ ॥ ১৫ ॥

যৎ—যা; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **পথি**—পথে; **দৃষ্টেন**—সাক্ষাৎ করার সময়; **গিরিশেন**—শিবের দ্বারা; **প্রসীদতা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **তৎ**—তা; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান করে; **জপন্তঃ চ**—জপ করেও; **পূজয়ন্তঃ চ**—পূজা করেও; **সংযতাঃ**—অত্যন্ত সংযমপূর্বক।

অনুবাদ

যখন প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্র তপস্যা করার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে মহাদেবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছিলেন। প্রাচীনবর্হির পুত্ররা অত্যন্ত সাবধানতা ও মনোযোগ সহকারে তা কীর্তন ও উপাসনা করে সেই উপদেশের ধ্যান করেছিলেন।

তাৎপর্য

তপস্যা করার জন্য অথবা কৃচ্ছ্রসাধন করার জন্য, কিংবা যে-কোন প্রকার ভক্তি অনুষ্ঠান করার জন্য যে গুরুদেবের পথ প্রদর্শনের আবশ্যকতার প্রয়োজন হয়, তা এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহারাজ প্রাচীনবর্হির দশজন পুত্র শিবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং শিব অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়ে তাঁদের তপস্যা করার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শিব সেই দশজন প্রচেতার গুরু হয়েছিলেন, এবং তাঁর শিষ্যরূপে তাঁরা এত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন যে, কেবল সেই উপদেশের উপর ধ্যান করার ফলে (*ধ্যায়ন্তঃ*) তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে সাফল্য লাভের রহস্য। দীক্ষালাভের পর গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অনন্যচিত্ত হয়ে গুরুদেবের সেই আদেশ অথবা উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করা, এবং কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত না হওয়া। এটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরেরও অভিমত, যিনি *ভগবদ্গীতার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪১) শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করার সময় বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিষ্যের কাছে প্রাণতুল্য। শিষ্যের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে কি না সেই সম্বন্ধে চিন্তা না করে, কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা। এইভাবে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশের ধ্যান করা, এবং সেটিই হচ্ছে ধ্যানের পূর্ণতা। তাঁর আদেশের ওপর কেবল ধ্যান করাই নয়, কিভাবে তা পূর্ণরূপে আরাধনা করা যায় এবং সম্পাদন করা যায়, তার উপায় অনুসন্ধান করাও তার কর্তব্য।

শ্লোক ১৬

বিদুর উবাচ

প্রচেতসাং গিরিত্রেণ যথাসীৎপথি সঙ্গমঃ ।
যদুতাহ হরঃ প্রীতস্তন্নো ব্রহ্মন্ বদার্থবৎ ॥ ১৬ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের; **গিরিত্রেণ**—মহাদেবের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **আসীৎ**—ছিল; **পথি**—পথে; **সঙ্গমঃ**—সাক্ষাৎ; **যৎ**—যা; **উত আহ**—বলেছিলেন; **হরঃ**—মহাদেব; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **বদ**—বলুন; **অর্থবৎ**—অর্থ প্রকাশ করে।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ! প্রচেতাদের সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল কেন? দয়া করে বলুন কিভাবে সেই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কিভাবে শিব তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, সেই কথা আমাকে বলুন।

তাৎপর্য

যখনই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অথবা ভগবানের মহান ভক্তদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, তখন তা শ্রবণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া উচিত। নৈমিষারণ্যের সভায়, যেখানে সূত গোস্বামী সমস্ত মহান ঋষিদের *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনিয়েছিলেন, সেখানেও সূত গোস্বামীকে মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেব গোস্বামীর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কারণ মহর্ষিরা জানতেন যে, শুকদেব গোস্বামী ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই যেমন পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার জন্য *ভগবদ্গীতার* বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তেমনই বিদুরও মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে শিব ও প্রচেতাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ১৭

সঙ্গমঃ খলু বিপ্রর্ষে শিবেনেহ শরীরিণাম্ ।
দুর্লভো মুনয়ো দধ্যুরসঙ্গাদ্যমভীপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥

সঙ্গমঃ—সঙ্গ; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **বিপ্র-ঋষে**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **শিবেন**—শিবসহ; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **শরীরিণাম্**—যারা জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **দুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **দধ্যুঃ**—ধ্যানপরায়ণ হয়েছিলেন; **অসঙ্গাৎ**—অন্য সব কিছু থেকে বিরক্ত হয়ে; **যম্**—যাঁকে; **অভীপ্সিতম্**—বাসনা করে।

অনুবাদ

মহর্ষি বিদুর বললেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে শিবের সাক্ষাৎ লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এমন কি সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত এবং শিবের সঙ্গলাভের জন্য সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন মহান ঋষিরাও তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারেন না।

তাৎপর্য

যেহেতু কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে, দেবাদিব মহাদেব এই জগতে অবতরণ করেন না, তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁকে আদেশ দেন, তখন সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে শিব অবতরণ করেন। এই সম্পর্কে *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, কলিযুগে শিব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ দর্শন প্রচার করার জন্য, ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *পদ্ম পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্তিনা ॥

শিব পার্বতীদেবীকে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন যে, বৌদ্ধদর্শন নিরসন করার জন্য, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর বেশে মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করবেন। এই সন্ন্যাসী হচ্ছেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য। বৌদ্ধ-দর্শনের প্রভাব পরাস্ত করে বেদান্ত-দর্শন প্রচার করার জন্য, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধ-দর্শনের সঙ্গে কিছু আপস মীমাংসা করতে হয়েছিল, এবং তার ফলে তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কারণ সেই সময় এর প্রয়োজন ছিল। তা না হলে মায়াবাদ দর্শন প্রচার করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন মায়াবাদ-দর্শন অথবা বৌদ্ধ-দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দুটিকেই বর্জন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন প্রচার করছে, এবং উভয় প্রকার মায়াবাদীদের দর্শনই বর্জন করেছে। গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধদর্শন ও শঙ্করাচার্যের দর্শন, উভয়ই হচ্ছে জড়-জাগতিক স্তরে মায়াবাদের বিভিন্ন রূপ। এই দুটি দর্শনেরই কোন রকম আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য নেই। *ভগবদ্গীতার* দর্শন, যার চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া, তা গ্রহণ করার পরেই কেবল আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সূচনা হয়। মানুষ সাধারণত শিবের পূজা করে জড়-জাগতিক লাভের জন্য, এবং যদিও তারা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারে না, তবুও তাঁর পূজা করার ফলে তাদের অনেক জড়-জাগতিক লাভ হয়।

শ্লোক ১৮

আত্মারামোঽপি যস্ত্বস্য লোককল্পস্য রাধসে ।
শক্ত্যা যুক্তো বিচরতি ঘোরয়া ভগবান্ ভবঃ ॥ ১৮ ॥

আত্ম-আরামঃ—আত্মতৃপ্ত; **অপি**—যদিও; **যঃ**—যিনি; **তু**—কিন্তু; **অস্য**—এই; **লোক**—জড় জগৎ; **কল্পস্য**—যখন প্রকাশিত হয়; **রাধসে**—এর অস্তিত্বের সহায়তা করার জন্য; **শক্ত্যা**—শক্তি; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **বিচরতি**—কার্য করে; **ঘোরয়া**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ভগবান্**—ভগবান; **ভবঃ**—শিব।

অনুবাদ

ভগবান শিব হচ্ছেন সব চাইতে শক্তিশালী দেবতা, যাঁর স্থান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরেই। তিনি আত্মারাম। যদিও এই জড় জগতে কোন বস্তুর প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই, তবুও বদ্ধ জীবদের কল্যাণের জন্য, তিনি সর্বদা কালী ও দুর্গা আদি ভয়ঙ্কর শক্তিসহ সর্বত্র বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

শিবকে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলা হয়। তিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠরূপে পরিচিত (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। তার ফলে শিবের একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যা রুদ্র-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় যেমন ব্রহ্মা থেকে আসছে, তেমনই রুদ্র-সম্প্রদায় শিব থেকে আসছে। শিব হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/৩/২০) উল্লেখ করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

এই বারোজন হচ্ছেন ভগবানের বাণীর প্রচারক মহাজন। শম্ভু হচ্ছে শিবের একটি নাম। তাঁর সম্প্রদায় বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় নামেও পরিচিত, এবং বর্তমান বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় বল্লভ-সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। বর্তমান ব্রহ্ম-সম্প্রদায় মধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শিব যদিও মায়াবাদ-দর্শন প্রচার করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যরূপে তাঁর লীলার শেষে, তিনি বৈষ্ণব-দর্শন প্রচার করেছেন—*ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে* । তিনি শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের আরাধনার উপর জোর দিয়েছেন। এই শ্লোকে তিনবার

সেই কথা বলে, বিশেষভাবে তাঁর অনুগামীদের তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র বাক্যবিন্যাস ও ব্যাকরণের ধাঁধাঁর দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। কেউ যদি প্রকৃতই মুক্তিলাভে আকাঙ্ক্ষী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। সেটিই হচ্ছে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অন্তিম উপদেশ।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিব সর্বদাই তাঁর জড় শক্তি (*শক্ত্যা ঘোরয়া*) সহ থাকেন। মহামায়া—দুর্গা অথবা কালী—সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। দুর্গা ও কালী সমস্ত অসুরদের সংহার করে তাঁর সেবা করেন। কখনও কখনও কালী এত ক্রোধান্বিতা হন যে, তিনি নির্বিচারে সমস্ত অসুরদের সংহার করতে থাকেন। বহুল প্রচলিত কালীর একটি ছবিতে দেখা যায় যে, তিনি অসুরদের মস্তকের মালা পরিহিতা এবং তাঁর বাঁ হাতে একটি নরমুণ্ড এবং ডান হাতে অসুর সংহার করার জন্য খড়্গ। মহাযুদ্ধ হচ্ছে কালীর অসুর সংহারকারী রূপের প্রতীক।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৪)

অসুরেরা জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা দুর্গা অথবা কালীর পূজা করার দ্বারা তাঁদের প্রসন্ন রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু অসুরেরা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন কালী কোন রকম বিচার না করে ব্যাপকভাবে তাদের সংহার করতে শুরু করেন। অসুরেরা শিবের শক্তির রহস্য জানে না, এবং তাই জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তারা কালী, দুর্গা অথবা শিবের পূজা করে। তাদের আসুরিক স্বভাবের জন্য তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে চায় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বলা হয়েছে—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

শিবের কার্য অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁকে দুর্গা অথবা কালীর শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। আর একটি বহুল প্রচলিত কালীর ছবিতে দেখা যায় যে, তিনি শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তা ইঙ্গিত করে যে, অসুর সংহার-কার্য থেকে কালীকে নিরস্ত করার জন্য কখনও কখনও শিবকে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। শিব যেহেতু মহামায়া (দুর্গাদেবীকে) নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই শিবের উপাসকেরা এই জড় জগতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত পদ প্রাপ্ত হন। শিবের পরিচালনায়, শিবের উপাসকেরা সব রকম জড়-জাগতিক সুবিধা লাভ করেন। তার বিপরীত, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব ক্রমশ নির্ধন হয়ে যান, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভক্তদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়তে দেন না। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর ভক্তদের অন্তর থেকে

বুদ্ধিদান করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার ভক্তিতে রত থেকে প্রেমপূর্বক আমার পূজা করে, তাদের আমি বুদ্ধি প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।"

এইভাবে ভগবান বিষ্ণু তাঁর ভক্তদের বুদ্ধি প্রদান করেন, যার ফলে ভক্তরা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারেন। ভক্তের যেহেতু কোন প্রকার জড় বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তাই তিনি কালী অথবা দুর্গার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসেন না।

শিব এই জড় জগতের তমোগুণেরও অধ্যক্ষ। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর শক্তি দুর্গাদেবী সমস্ত জীবদের অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখেন (*যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেন সংস্থিতা*)। ব্রহ্মা ও শিব উভয়েই বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ আর শিব হচ্ছেন সংহার কার্যের অধ্যক্ষ। শিব তাঁর সেই কার্য সম্পাদন করেন তাঁর শক্তি কালী অথবা দুর্গার সহায়তায়। তাই এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব তাঁর ভয়ঙ্কর শক্তি (*শক্ত্যা ঘোরয়া*) সহ থাকেন, এবং সেটিই হচ্ছে শিবের প্রকৃত স্থিতি।

শ্লোক ১৯

মৈত্রেয় উবাচ

প্রচেতসঃ পিতুর্বাক্যং শিরসাদায় সাধবঃ ।
দিশং প্রতীচীং প্রযযুস্তপস্যাদৃতচেতসঃ ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **প্রচেতসঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হির সমস্ত পুত্রেরা; **পিতুঃ**—পিতার; **বাক্যম্**—বাক্য; **শিরসা**—মস্তকে; **আদায়**—ধারণ করে; **সাধবঃ**—সমস্ত পবিত্র; **দিশম্**—দিক; **প্রতীচীম্**—পশ্চিম; **প্রযযুঃ**—গিয়েছিলেন; **তপসি**—তপস্যায়; **আদৃত**—নিষ্ঠা সহকারে গ্রহণ করে; **চেতসঃ**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! সাধু চরিত্র প্রচেতারা তাঁদের পিতা প্রাচীনবর্হির বাক্য শিরোধার্য করে পিতার আদেশ পালন করার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সাধবঃ* শব্দটি (যার অর্থ হচ্ছে 'পবিত্র' অথবা 'সদাচারী') অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে *সাধু* শব্দ থেকে। প্রকৃত *সাধু* হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। প্রাচীনবর্হির পুত্রদের *সাধবঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের পিতার বাধ্য ছিলেন। পিতা, রাজা ও গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁদের ভগবানেরই মতো সম্মান করতে হয়। পিতা, গুরু ও রাজার কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের অধীনস্থদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যে, চরমে তাঁরা যেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন। সেটিই হচ্ছে গুরুজনের কর্তব্য এবং অধীনস্থের কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের সেই আদেশ পালন করা। *শিরসা* ('শিরোধার্য করে') শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রচেতারা তাঁদের পিতার নির্দেশ শিরোধার্য করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা বিনয়াবনত চিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সসমুদ্রমুপ বিস্তীর্ণমপশ্যন্ সুমহৎসরঃ ।
মহন্মন ইব স্বচ্ছং প্রসন্নসলিলাশয়ম্ ॥ ২০ ॥

স-সমুদ্রম্—সমুদ্রের নিকটে; **উপ**—প্রায়; **বিস্তীর্ণম্**—অত্যন্ত প্রশস্ত ও দীর্ঘ; **অপশ্যন্**—তাঁরা দেখেছিলেন; **সু-মহৎ**—অতি বিশাল; **সরঃ**—সরোবর; **মহৎ**—মহাত্মা; **মনঃ**—মন; **ইব**—সদৃশ; **সু-অচ্ছম্**—নির্মল; **প্রসন্ন**—আনন্দময়; **সলিল**—জল; **আশয়ম্**—আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

এইভাবে ভ্রমণ করার সময়, প্রচেতারা এক বিশাল সরোবর দর্শন করলেন, যা প্রায় সমুদ্রের মতো বিস্তৃত ছিল। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের নির্মল অন্তঃকরণের মতো স্বচ্ছ, এবং জলচরেরা এত বড় জলাশয়ের শরণ গ্রহণ করার ফলে, তাদের অত্যন্ত শান্ত ও প্রসন্ন বলে প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

স-সমুদ্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সমুদ্রের সন্নিকটে'। সেই জলাশয়টি ছিল একটি উপসাগরের মতো, কারণ তা সমুদ্র থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। *উপ* শব্দটির

অর্থ হচ্ছে 'প্রায়', এবং এই শব্দটি বহুভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন *উপপতি*, যা ইঙ্গিত করে 'প্রায় পতির মতো', অর্থাৎ যেই প্রেমিক পতির মতো আচরণ করে। *উপ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'বড়', 'ছোট' অথবা 'নিকটে'। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে, সেই জলাশয়টি ছিল একটি বিশাল উপসাগর বা সরোবর। কিন্তু সেটি সমুদ্রের মতো তরঙ্গসংকুল ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ। অনেক মহাত্মা হতে পারে—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তদেরও বলা হয় মহাত্মা—তবে তাঁরা অত্যন্ত দুর্লভ। যোগী ও জ্ঞানীদের মধ্যে বহু মহাত্মা দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ (*স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, ভগবদ্গীতা* ৭/১৯)। ভক্তের মন সর্বদাই শান্ত, স্নিগ্ধ ও বাসনাশূন্য, কারণ তিনি সর্বদাই *অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্* । ভৃত্যরূপে, সখারূপে, পিতারূপে, মাতারূপে অথবা প্রেয়সীরূপে ভগবানের সেবা করা ছাড়া তাঁর আর কোন বাসনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে, ভক্ত সর্বদাই অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সরোবরের জলচর প্রাণীরাও যে অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ ছিল, তাও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভগবদ্ভক্তের শিষ্য যেহেতু একজন মহাত্মার শরণ গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি সর্বদাই অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ, এবং তিনি কখনও ভব-সাগরের তরঙ্গের দ্বারা বিচলিত হন না।

এই জড় জগতকে প্রায়ই অজ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়। এই সাগরে সব কিছুই বিক্ষুব্ধ। মহান ভগবদ্ভক্তের মনও একটি সমুদ্র বা বিশাল সরোবরের মতো, কিন্তু তাতে কোন রকম বিক্ষোভ নেই। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪১) বলা হয়েছে—*ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন* । যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) আরও বলা হয়েছে—*যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে* । যদি জীবনে দুঃখদুর্দশা আসেও, তবুও ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। তাই কেউ যখন মহাত্মা অথবা মহান ভগবদ্ভক্তের শরণাগত হন, তখন তিনি শান্ত হয়ে যান। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে* (*মধ্য* ১৯/১৪৯) বলা হয়েছে—*কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'* । কিন্তু যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীরা সর্বদাই বহু বাসনায় পূর্ণ, তাই তারা অশান্ত। কেউ তর্ক করতে পারে যে, ভক্তদেরও তো বাসনা রয়েছে, কারণ তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু এই প্রকার বাসনা মনকে বিচলিত করে না। ভক্ত যদিও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তবুও ভগবদ্ভক্ত জীবনের যে-কোন পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, এই শ্লোকে *মহন্মনঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, সেই সরোবরের জল মহান ভগবদ্ভক্তের মনের মতো শান্ত ও স্নিগ্ধ ছিল।

শ্লোক ২১

নীলরক্তোৎপলাম্ভোজকহ্লারেন্দীবরাকরম্ ।
হংসসারসচক্রাহ্বকারণ্ডবনিকূজিতম্ ॥ ২১ ॥

নীল—নীল; **রক্ত**—লাল; **উৎপল**—পদ্ম; **অম্ভঃ-জ**—জলজাত; **কহ্লার**—এক প্রকার পদ্ম; **ইন্দীবর**—আর এক প্রকার পদ্ম; **আকরম্**—খনি; **হংস**—হংস; **সারস**—সারস; **চক্রাহ্ব**—চক্রবাক; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব পক্ষী; **নিকূজিতম্**—কূজনের দ্বারা মুখরিত।

অনুবাদ

সেই বিশাল সরোবরে নানা প্রকার পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের কোনটির রঙ নীল, কোনটির রঙ লাল, কোনটি রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, আবার কোনটি সন্ধ্যাবেলা প্রস্ফুটিত হয়। সেই সমস্ত ইন্দীবর, কহ্লার আদি পদ্মফুলে সেই সরোবরটি এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে, তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেটি একটি ফুলের আকর। আর সেই সরোবরের তীর হংস, সারস, চক্রবাক ও অন্যান্য পাখির কূজনে মুখরিত ছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আকরম্* ('খনি') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সেই সরোবরটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটি পদ্মফুলের খনি, যেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার পদ্মফুল উৎপন্ন হয়। তাদের কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি রাত্রে ও কোনটি সন্ধ্যায়, এবং সেই অনুসারে ও তাদের রঙ অনুসারে, তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে। সেই সমস্ত ফুলে সরোবরটি পূর্ণ ছিল, এবং যেহেতু সেই সরোবরটি ছিল অত্যন্ত শান্ত ও নিস্তব্ধ এবং পদ্মফুলে পূর্ণ, এবং হংস, সারস, চক্রবাক, কারণ্ডব আদি পক্ষীরা তীরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুরে গান করছিল, তার ফলে সেই পরিবেশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে যেমন বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে, তেমনই বিভিন্ন প্রকার পক্ষী, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি রয়েছে। সব কিছুই প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে বিভক্ত। হংস, সারস আদি পক্ষী, যারা স্বচ্ছ জলে বিচরণ করে এবং পদ্মফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে, তারা নোংরা স্থানে আবর্জনাভোজী কাক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তেমনই কিছু মানুষ রজ ও তমোগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার কিছু মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টি এমনই বিচিত্র যে, প্রতিটি সমাজে সর্বদাই বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই পদ্মফুলে পূর্ণ সেই বিশাল সরোবরের তটে সেই সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করার জন্য উন্নত স্তরের পক্ষীরা বাস করত।

শ্লোক ২২

মত্তভ্রমরসৌস্বর্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপম্ ।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবম্ ॥ ২২ ॥

মত্ত—উন্মত্ত; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **সৌ-স্বর্য**—সুন্দর স্বরে গুঞ্জনরত; **হৃষ্ট**—আনন্দভরে; **রোম**—শরীরের লোম; **লতা**—বল্লরি; **অঙ্ঘ্রিপম্**—বৃক্ষ; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **কোশ**—কোশ; **রজঃ**—পরাগ; **দিক্ষু**—চতুর্দিকে; **বিক্ষিপৎ**—বিক্ষেপ করে; **পবন**—বায়ু; **উৎসবম্**—উৎসব।

অনুবাদ

সেই সরোবরের চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ ও লতা ছিল, এবং তাদের চারপাশে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল। ভ্রমরদের সেই মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করে, সেখানকার গাছপালাগুলি যেন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠেছিল, এবং তখন পদ্মফুলের পরাগ চতুর্দিকে বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তার ফলে সেখানে এক আনন্দময় মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৃক্ষ ও লতারাও এক প্রকার জীব। যখন ভ্রমরেরা মধু সংগ্রহ করার জন্য বৃক্ষ-লতায় আসে, তখন তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। বায়ুও সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে, পদ্মফুলের পরাগ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। তার সঙ্গে তখন হংসের মধুর কলধ্বনি এবং সরোবরের শান্ত পরিবেশও মিলিত হয়। প্রচেতাদের কাছে তখন মনে হয়েছিল, সেই স্থানটিতে যেন এক নিরন্তর মহোৎসব হচ্ছে। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, প্রচেতারা শিবলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা হিমালয় পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

তত্র গান্ধর্বমাকর্ণ্য দিব্যমার্গমনোহরম্ ।
বিসিস্ম্যু রাজপুত্রাস্তে মৃদঙ্গপণবাদ্যনু ॥ ২৩ ॥

তত্র—সেখানে; **গান্ধর্বম্**—মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দিব্য**—স্বর্গীয়; **মার্গ**—সুষম; **মনঃ-হরম্**—সুন্দর; **বিসিস্ম্যুঃ**—তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন; **রাজ-**

পুত্রাঃ—রাজা বর্হিষতের পুত্রগণ; **তে**—তাঁরা সকলে; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—নাকাড়া; **আদি**—সব মিলে; **অনু**—সর্বদা।

অনুবাদ

রাজপুত্রেরা যখন মৃদঙ্গ ও পণবসহ অত্যন্ত সুমধুর রাগরাগিণীর ধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সরোবরের সন্নিকটে বিভিন্ন ফুল ও প্রাণী ছাড়াও সেখানে অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতের ধ্বনিও শোনা গিয়েছিল। এই দৃশ্যের তুলনায় নির্বিশেষবাদীদের বৈচিত্র্যহীন শূন্য নিতান্তই অপ্রীতিকর। সৎ-চিৎ-আনন্দময়ত্ব লাভই হচ্ছে জীবের প্রকৃত সিদ্ধি। নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু সৃষ্টির বৈচিত্র্য অস্বীকার করে, তাই তারা প্রকৃতপক্ষে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। প্রচেতারা যে স্থানটিতে এসেছিলেন, তা ছিল শিবের ধাম। নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত শিবের পূজা করে, কিন্তু শিব তাঁর ধামে কখনই বৈচিত্র্যবিহীন নন। এইভাবে মানুষ যেখানেই যায়, তা শিবলোক হোক, বিষ্ণুলোক হোক অথবা ব্রহ্মলোক হোক, পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের বৈচিত্র্য সেখানে থাকবে।

শ্লোক ২৪-২৫

তর্হ্যেব সরসস্তস্মান্নিষ্ক্রামন্তং সহানুগম্ ।
উপগীয়মানমমরপ্রবরং বিবুধানুগৈঃ ॥ ২৪ ॥
তপ্তহেমনিকায়াভং শিতিকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ।
প্রসাদসুমুখং বীক্ষ্য প্রণেমুর্জাতকৌতুকাঃ ॥ ২৫ ॥

তর্হি—তখনই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সরসঃ**—জল থেকে; **তস্মাৎ**—সেখান থেকে; **নিষ্ক্রামন্তম্**—বেরিয়ে আসছেন; **সহ-অনুগম্**—মহাত্মাগণ-সহ; **উপগীয়মানম্**—অনুগামীদের দ্বারা বন্দিত; **অমর-প্রবরম্**—দেবতাদের মধ্যে প্রধান; **বিবুধ-অনুগৈঃ**—তাঁর অনুচরগণ-সহ; **তপ্ত-হেম**—গলিত সোনা; **নিকায়-আভম্**—তাঁর গায়ের রঙ; **শিতি-কণ্ঠম্**—নীলকণ্ঠ; **ত্রি-লোচনম্**—তিন চক্ষুবিশিষ্ট; **প্রসাদ**—কৃপাময়; **সু-মুখম্**—সুন্দর মুখমণ্ডল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **প্রণেমুঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **জাত**—উৎপন্ন হয়েছিল; **কৌতুকাঃ**—কৌতূহল হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রচেতারা তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে দেবশ্রেষ্ঠ শিবকে তাঁর পার্ষদগণ-সহ জল থেকে উত্থিত হতে দেখলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল ঠিক তপ্ত-কাঞ্চনের মতো, তাঁর কণ্ঠ ছিল নীলাভ, এবং তাঁর তিনটি চক্ষু ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত কৃপাপূর্ণ নয়নে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছিলেন। তাঁর অনুগামী গন্ধর্বাদি সংগীতজ্ঞেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করছিলেন। শিবকে দর্শন করে প্রচেতারা অত্যন্ত কৌতূহল-বিশিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিবুধানুগৈঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, শিবের সঙ্গে গন্ধর্ব, কিন্নর আদি উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা সর্বদা থাকেন। তাঁরা সকলে সঙ্গীত-বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী, এবং শিব সর্বদা তাঁদের দ্বারা পূজিত হন। ছবিতে সাধারণত শিবকে শ্বেতবর্ণ রূপে দেখানো হয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর গায়ের রং ঠিক সাদা নয়, তা ছিল তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ বা উজ্জ্বল পীতবর্ণের মতো। যেহেতু শিব সর্বদাই অত্যন্ত কৃপালু, তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শিবকে নিম্নবর্ণের লোকেরাও প্রসন্ন করতে পারে। কেবল বিল্বপত্র ও প্রণতি নিবেদন করার মাধ্যমে তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। তিনি অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হন বলে, তাঁর নাম আশুতোষ।

যারা সাধারণত জড়-জাগতিক উন্নতি কামনা করে, তারা তাদের ঈপ্সিত বরলাভের জন্য শিবের কাছে যায়। মহাদেব অত্যন্ত কৃপালু বলে, তিনি অতি শীঘ্র তাঁর ভক্তদের মনোবাসনা অনুসারে বরদান করেন। অসুরেরা শিবের এই উদারতার সুযোগ নেয় এবং কখনও কখনও তারা শিবের কাছ থেকে এমন বর প্রাপ্ত হয়, যা অন্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যেমন, বৃকাসুর শিবের থেকে বর নিয়েছিল যে, সে কারও মস্তক স্পর্শ করা মাত্রই তার মৃত্যু হবে। শিব যদিও কখনও কখনও অত্যন্ত উদারতাপূর্বক তাঁর ভক্তদের বরদান করেন, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে, অত্যন্ত ধূর্ত অসুরেরা অন্যায়ভাবে এই বর পরীক্ষা করে দেখতে চায়। যেমন, বৃকাসুর তার অভিলষিত বর প্রাপ্ত হওয়ার পর, শিবের মস্তক স্পর্শ করতে চেয়েছিল। কিন্তু, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরা কখনও এই প্রকার বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং ভগবান বিষ্ণুও তাঁর ভক্তদের কখনও এমন বরদান করেন না, যা সারা পৃথিবী জুড়ে অশান্তি সৃষ্টি করে।

শ্লোক ২৬

স তান্ প্রপন্নার্তিহরো ভগবান্‌ধর্মবৎসলঃ ।
ধর্মজ্ঞান্ শীলসম্পন্নান্ প্রীতঃ প্রীতানুবাচ হ ॥ ২৬ ॥

সঃ—শ্রীশিব; **তান্**—তাঁদের; **প্রপন্ন-আর্তি-হরঃ**—যিনি শরণাগতদের সন্তাপ দূর করেন; **ভগবান্**—প্রভু; **ধর্ম-বৎসলঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ধর্ম-জ্ঞান্**—ধর্মনীতি সম্বন্ধে যাঁরা অবগত; **শীল-সম্পন্নান্**—অত্যন্ত সদাচারী; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রীতান্**—অত্যন্ত ভদ্র আচরণ, **উবাচ**—তাঁদের বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

ভগবান শিব প্রচেতাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি সাধারণত পুণ্যবান ও সদাচারী ব্যক্তিদের রক্ষক। রাজকুমারদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন—

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, এবং এখানে শিবকে *ধর্মবৎসল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ধর্মবৎসল* বলতে তাঁদের বোঝায়, যাঁরা ধর্মের নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করেন। তা সত্ত্বেও, এই দুটি শব্দের অতিরিক্ত মাহাত্ম্য রয়েছে। কখনও কখনও শিবকে রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা সর্বদা খুব একটা ধর্মপরায়ণ হয় না এবং তাদের কার্যকলাপও পবিত্র নয়, কিন্তু যেহেতু তারা জড়-জাগতিক লাভের আশায় শিবের পূজা করে, তাই তারা কখনও কখনও ধর্মের অনুশাসন পালন করে। শিব যখনই দেখেন যে তাঁর ভক্তেরা ধর্মের নিয়ম পালন করছে, তখন তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন। প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতারা স্বভাবতই অত্যন্ত পুণ্যবান ও স্নিগ্ধ ছিলেন, এবং তার ফলে শিব তৎক্ষণাৎ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই রাজকুমারেরা ছিলেন বৈষ্ণবের সন্তান, এবং তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীরুদ্র উবাচ

যূয়ং বেদিষদঃ পুত্রা বিদিতং বশ্চিকীর্ষিতম্ ।
অনুগ্রহায় ভদ্রং ব এবং মে দর্শনং কৃতম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শিব বললেন; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **বেদিষদঃ**—মহারাজ প্রাচীনবর্হির; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **বিদিতম্**—জেনে; **বঃ**—তোমাদের; **চিকীর্ষিতম্**—বাসনা; **অনুগ্রহায়**—তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভদ্রম্**—তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক; **বঃ**—তোমরা সকলে; **এবম্**—এইভাবে; **মে**—আমার; **দর্শনম্**—দর্শন; **কৃতম্**—তোমরা করেছ।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রগণ! তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। আমি জানি তোমরা কি করতে চাও, এবং তাই তোমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আমি তোমাদের গোচরীভূত হয়েছি।

তাৎপর্য

এই উক্তির দ্বারা শিব ইঙ্গিত করেছেন যে, রাজপুত্রেরা যে কি করতে যাচ্ছিলেন, সেই সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে যাচ্ছিলেন। সেই কথা অবগত হয়ে, তৎক্ষণাৎ শিব তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হবে। তা ইঙ্গিত করে যে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হননি, কিন্তু ভগবানের সেবা করার অভিলাষী, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করেন। তাই ভক্তকে পৃথকভাবে দেবতাদের প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে হয় না। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের সকলকে প্রসন্ন করতে পারেন। ভক্তকে দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক বর প্রার্থনা করতে হয় না, কারণ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দেবতারা তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তা সবই প্রদান করেন। দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের সেবক, এবং তাঁরা সর্বদাই সমস্ত পরিস্থিতিতে ভক্তদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যখন ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হন, তখন দেবতাদের কাছ থেকে জড় ঐশ্বর্য প্রাপ্তির কি আর কথা, মুক্তিদেবী স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হয়ে, তাঁদের সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দেবতারাই ভগবদ্ভক্তের সেবা করার সুযোগের প্রতীক্ষা করছেন। তার ফলে কৃষ্ণভক্তকে কখনও জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য অথবা মুক্তির জন্য কোন রকম প্রয়াস করতে হয় না। ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়ে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত লাভ প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২৮

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ২৮ ॥

যঃ—যে-কেউ; **পরম্**—চিন্ময়; **রংহসঃ**—নিয়ন্তার; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ত্রি-গুণাৎ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে; **জীব-সংজ্ঞিতাৎ**—জীব নামক; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **প্রপন্নঃ**—শরণাগত; **সঃ**—তিনি; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **হি**—নিঃসন্দেহে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

শ্রীশিব বললেন—যে ব্যক্তি জড়া প্রকৃতি ও জীব আদি সব কিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

শ্রীশিব যে কেন রাজকুমারদের সমক্ষে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই কথা এখন তিনি বিশ্লেষণ করছেন। তার কারণ হচ্ছে সেই রাজকুমারেরা সকলেই ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ জেনে, পূর্ণজ্ঞানে আমার শরণাগত হন, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

সাধারণ মানুষের পক্ষে শিবের দর্শন লাভ করা দুর্লভ, এবং তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শরণাগত ভক্তের দর্শনও অত্যন্ত দুর্লভ (*স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। প্রচেতারা যেহেতু সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের শরণাগত ছিলেন, তাই শিব বিশেষভাবে তাঁদের দেখতে এসেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়,* এই মন্ত্রেও বাসুদেবকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু বাসুদেব হচ্ছেন পরম সত্য, তাই শিব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যারা বাসুদেবের ভক্ত, যারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ কেবল সাধারণ জীবেরই আরাধ্য নন, তিনি শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদেরও আরাধ্য। *যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। ব্রহ্মা, শিব, বরুণ, ইন্দ্র, চন্দ্র ও অন্যান্য সমস্ত দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

সেটিই হচ্ছে ভক্তির বৈশিষ্ট্য। যিনি কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি যারা ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার প্রয়াস করছে, তাদেরও অত্যন্ত প্রিয় হয়ে যান। তেমনই, সমস্ত দেবতারাও দেখেন কারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান বাসুদেবের শরণাগত হয়েছেন। যেহেতু প্রচেতারা বাসুদেবের শরণাগত হয়েছিলেন, তাই শিব স্বেচ্ছায় তাদের দর্শন করতে এসেছিলেন।

ভগবান বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণকে *ভগবদ্গীতায়* পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন ভোক্তা (*পুরুষ*) এবং পরম (*উত্তম*)। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ সব কিছুর ভোক্তা। জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পুরুষ (ভোক্তা) নয়, সে হচ্ছে প্রকৃতি। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বর্ণনা করা হয়েছে—*অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্*। এইভাবে জীব হচ্ছে প্রকৃতি বা ভগবানের তটস্থা-শক্তি। জড়া প্রকৃতির সংসর্গে আসার ফলে, সে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতের সমস্ত জীব আমার শাশ্বত অংশ। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অত্যন্ত কঠোরভাবে সংগ্রাম করছে।"

জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে জীব কেবল বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করে। প্রকৃতপক্ষে, সুখ উপভোগ করার জন্য সে এত কঠিন পরিশ্রম করে যে, এমন কি সে জড় জগতের বিষয়গুলিও ভোগ করতে পারে না। তার ফলে তাকে কখনও কখনও প্রকৃতি বা জীব বলা হয়, কারণ সে তটস্থা-শক্তিতে অবস্থিত। জীব যখন প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় *জীব-সংজ্ঞিত*। জীব দুই প্রকার—*ক্ষর* ও *অক্ষর*। যারা অধঃপতিত হয়ে বদ্ধ হয়েছে, তাদের বলা হয় *ক্ষর*, এবং যারা বদ্ধ নয়, তাদের বলা হয় *অক্ষর*। অধিকাংশ জীবই চিজ্জগতে রয়েছে এবং তাদের বলা হয় *অক্ষর*। তারা ব্রহ্ম পদে অর্থাৎ পূর্ণ চিন্ময় অস্তিত্বে স্থিত রয়েছে। তারা জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা বদ্ধ জীবদের থেকে ভিন্ন।

ক্ষর ও অক্ষর, উভয়েরই অতীত হওয়ার ফলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবকে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৮) পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা

বলতে পারে যে, বাসুদেব হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অধীন তত্ত্ব, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* । শ্রীকৃষ্ণ যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস, সেই কথা *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* (৫/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটি* । নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেই রশ্মিতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ভাসছে। এইভাবে বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান, এবং যাঁরা পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত, শ্রীশিব তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, জীবেরা যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়, যে-কথা তিনি *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে (১৮/৬৬) বলেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* ।

এই শ্লোকে *সাক্ষাৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তথাকথিত বহু ভক্ত রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল কর্মী ও জ্ঞানী। কারণ তারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নয়। কর্মীরা কখনও কখনও তাদের কর্মের ফল ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করে, এবং এই নিবেদনকে বলা হয় *কর্মার্পণম্* । তা হচ্ছে সকাম কর্ম, কারণ কর্মীরা শ্রীবিষ্ণুকে শিব ও ব্রহ্মার মতো একজন দেবতা বলে মনে করে। যেহেতু তারা শ্রীবিষ্ণুকে দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাই তাদের মতে, দেবতাদের শরণাগত হওয়া বাসুদেবের শরণাগত হওয়ারই সমান। সেই মতটি এখানে অস্বীকার করা হয়েছে, কারণ তা হলে শিব বলতেন যে, তাঁর শরণাগত হওয়া, ভগবান বাসুদেব বা বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া অথবা ব্রহ্মার শরণাগত হওয়া একই। কিন্তু, শিব সেই কথা বলেননি কারণ তিনি নিজেও বাসুদেবের শরণাগত, এবং অন্য কেউ যখন বাসুদেবের শরণাগত হন, তখন তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হন। সেই কথা তিনি এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিবের ভক্তরা শিবের প্রিয় নন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শিবের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ২৯

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্ ।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ২৯ ॥

স্ব-ধর্ম-নিষ্ঠঃ—যিনি তাঁর নিজের ধর্ম বা বৃত্তিতে স্থিত; **শত-জন্মভিঃ**—একশ জন্ম ধরে; **পুমান্**—জীব; **বিরিঞ্চতাম্**—ব্রহ্মার পদ; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **ততঃ**—তার পর; **পরম্**—অধিকতর; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মাম্**—আমাকে প্রাপ্ত হয়; **অব্যাকৃতম্**—অবিচলিতভাবে; **ভাগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অথ**—অতএব; **বৈষ্ণবম্**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; **পদম্**—পদ; **যথা**—যেমন; **অহম্**—আমি; **বিবুধাঃ**—দেবতা; **কলা-অত্যয়ে**—জড় জগতের বিনাশের পর।

অনুবাদ

মানুষ শত জন্ম ধরে যথাযথভাবে স্বধর্ম আচরণ করার ফলে, ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হন, এবং তিনি যদি তার থেকেও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি আমাকে লাভ করতে পারেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন, তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে উন্নীত হন। আমি ও অন্যান্য দেবতারা এই জড় জগতের বিনাশের পর সেই লোক প্রাপ্ত হই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিবর্তনের পন্থার চরম পরিণতি সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রদান করে। বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী যে বর্ণনা করেছেন—*প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদম্*, সেই বর্ণনা অনুসারে প্রলয় থেকে আমরা এই বিবর্তনের পন্থার বিচার করতে পারি। প্রলয়ের সময় যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হয়, তখন বহু মাছ ও জলচর প্রাণী থাকে, এবং সেই জলচর প্রাণীদের থেকে বৃক্ষলতা ইত্যাদির বিকাশ হয়। তা থেকে কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপদের বিকাশ হয়, এবং তা থেকে পক্ষী, পশু এবং অবশেষে মানুষ এবং চরমে সভ্য মানুষের বিকাশ হয়। সভ্য মানুষেরা একটি সন্ধিস্থলে রয়েছেন, যেখান থেকে তাঁরা আরও উন্নতি লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবন বিকশিত করতে পারেন। এখানে বলা হয়েছে *স্ব-ধর্ম-নিষ্ঠঃ*, অর্থাৎ জীব যখন সভ্য জীবন প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বা স্বধর্ম আচরণ করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) তার ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—

চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

"জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং তাদের কর্ম অনুসারে, আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি।"

সভ্য মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ থাকা অবশ্য কর্তব্য, এবং প্রত্যেকের কর্তব্য সেই বর্ণবিভাগ অনুসারে যথাযথভাবে তার স্বধর্ম আচরণ করা। এখানে বলা হয়েছে *স্ব-ধর্ম-নিষ্ঠঃ,* অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, অথবা শূদ্র হোক, তাতে কিছু যায় আসে না; কেউ যদি তার স্বীয় বর্ণে অবিচলিত থেকে যথাযথভাবে তার বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তা হলে তাকে সভ্য মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে। তা না হলে সে একটি পশুর তুল্য। এখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন একশ জন্ম ধরে তাঁর স্বধর্ম আচরণ করেন (যেমন, কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেন), তা হলে তিনি ব্রহ্মলোকে, যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন, সেই লোকে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হন। শিবলোক বা সদাশিবলোক নামেও একটি লোক রয়েছে, যা চিৎ-জগৎ ও জড় জগতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়ার পর কেউ যদি আরও অধিক যোগ্য হন, তা হলে তিনি শিবলোকে উন্নীত হন। তেমনই, কেউ যদি আরও অধিক যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। বৈকুণ্ঠলোকই হচ্ছে সকলের লক্ষ্য, এমন কি দেবতারাও সেখানে উন্নীত হতে চান। সব রকম জড়-জাগতিক অভিলাষ-রহিত ভগবদ্ভক্তই কেবল সেই স্থান প্রাপ্ত হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ব্রহ্মলোকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও জড়-জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না *(আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন)* । তেমনই, শিবলোকে উন্নীত হলেও জীব সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হতে পারে না, কারণ শিবলোক তটস্থ স্থানে অবস্থিত। কিন্তু কেউ যদি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য, এবং ক্রমবিকাশের চরম গতি প্রাপ্ত হন (*মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*)। পক্ষান্তরে, এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মানব-সমাজে যাঁদের চেতনা বিকশিত হয়েছে, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোকে তাঁরা উন্নীত হতে পারেন। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)। যে ভক্ত পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, যিনি অন্য কোন লোক বা গ্রহের প্রতি আর আকৃষ্ট নন, এমন কি যিনি ব্রহ্মলোক বা শিবলোকের প্রতিও আকৃষ্ট নন, তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণলোকে স্থানান্তরিত হন *(মামেতি)* । সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম পূর্ণতা এবং বিবর্তনের পন্থার চরম পরিণতি।

শ্লোক ৩০

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা ।
ন মদ্ভাগবতানাং চ প্রেয়ান্যোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩০ ॥

অথ—অতএব; **ভাগবতাঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **যূয়ম্**—তোমরা সকলে; **প্রিয়াঃ**—আমার অত্যন্ত প্রিয়; **স্থ**—তোমরা হও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেমন; **ন**—না; **মৎ**—আমার থেকে; **ভাগবতানাম্**—ভক্তদের; **চ**—ও; **প্রেয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—হয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

তোমরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, এবং তাই আমার কাছে তোমরা স্বয়ং ভগবানের মতো শ্রদ্ধেয়। সেই সূত্রে আমি জানি যে, ভক্তরাও আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। তাই ভক্তদের কাছে আমার মতো প্রিয় আর কেউ নয়।

তাৎপর্য

বলা হয়, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভক্তরা শিবেরও ভক্ত। বৃন্দাবনে গোপেশ্বর শিবের মন্দির রয়েছে। গোপীরা কেবল শিবেরই পূজা করতেন না, তাঁরা কাত্যায়নীদেবী বা দুর্গাদেবীরও পূজা করতেন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা শিবকে অশ্রদ্ধা করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তরূপে তাঁর পূজা করেন। তার ফলে যখনই ভগবদ্ভক্ত শিবের পূজা করেন, তখন তিনি শিবের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করতে পারেন, এবং তিনি কখনও তাঁর কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে যে, মানুষ সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের আশায় দেব-দেবীদের পূজা করে। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ* । কামের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা দেব-দেবীদের পূজা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনই তা করেন না, কারণ তিনি কখনই কামের দ্বারা পরিচালিত হন না। সেটিই হচ্ছে শিবের প্রতি ভগবদ্ভক্তের শ্রদ্ধা এবং অসুরদের শ্রদ্ধার মধ্যে পার্থক্য। অসুরেরা কোন রকম বর লাভের আশায় শিবের পূজা করে, এবং সেই বরের অপব্যবহার করে তারা চরমে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিহত হয়, এবং এইভাবে তারা মুক্তিলাভ করে।

শিব যেহেতু ভগবানের পরম ভক্ত, তাই ভগবানের সমস্ত ভক্তরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শিব প্রচেতাদের বলেছিলেন যে, যেহেতু তাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাই তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শিব কেবল প্রচেতাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ ছিলেন না; ভগবানের সমস্ত ভক্তরাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভগবদ্ভক্তেরা শিবের কেবল প্রিয়ই নন, শিব তাঁদের ভগবানেরই মতো শ্রদ্ধা করেন। তেমনই, ভগবদ্ভক্তেরাও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে শিবেরও পূজা করেন। তাঁরা তাঁকে পৃথক ভগবানরূপে পূজা করেন না। নাম অপরাধের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হর বা শিবের নাম কীর্তন করা এবং হরির নাম কীর্তন করাকে সমান বলে মনে করা একটি অপরাধ। ভক্তদের সব সময় অবগত থাকা উচিত যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শিব হচ্ছেন তাঁর ভক্ত। ভক্তকে ভগবানেরই মতো সম্মান করা উচিত, এবং কখনও কখনও ভক্তকে ভগবানের থেকেও অধিক সম্মান করা হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং কোনও সময়ে শিবের পূজা করেছিলেন। ভগবান যদি ভক্তের পূজা করেন, তা হলে ভগবদ্ভক্ত কেন ভক্তকে ভগবানেরই সমান স্তরে পূজা করবেন না? এটিই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে, শিব কেবল লৌকিকতার খাতিরে অসুরদের বরদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের যাঁরা ভক্ত, তাঁদের প্রতিই কেবল প্রীতিপরায়ণ।

শ্লোক ৩১

ইদং বিবিক্তং জপ্তব্যং পবিত্রং মঙ্গলং পরম্ ।
নিঃশ্রেয়সকরং চাপি শ্রূয়তাং তদ্বদামি বঃ ॥ ৩১ ॥

ইদম্—এই; **বিবিক্তম্**—বিশেষ; **জপ্তব্যম্**—সর্বদা জপ করা কর্তব্য; **পবিত্রম্**—অত্যন্ত পবিত্র; **মঙ্গলম্**—কল্যাণকর; **পরম্**—দিব্য; **নিঃশ্রেয়স-করম্**—অত্যন্ত লাভজনক; **চ**—ও; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **তৎ**—তা; **বদামি**—আমি বলছি; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

এখন আমি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করব, যা কেবল দিব্য, পবিত্র ও মঙ্গলময়ই নয়, অধিকন্তু জীবনের চরম লক্ষ্যলাভের অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। আমি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করব, তখন তা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

বিবিক্তম্ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও মনে করা উচিত নয় যে, শিব যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি সাম্প্রদায়িক ছিল; পক্ষান্তরে সেটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়, এতই গোপনীয় যে, জীবনের চরম মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য সাধনের অভিলাষী ব্যক্তিদের পক্ষে শিবের এই নির্দেশ অনুসারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য, যা শিব নিজেও করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যনুক্রোশহৃদয়ো ভগবানাহ তাঞ্ছিবঃ ।
বদ্ধাঞ্জলীন্ রাজপুত্রান্নারায়ণপরো বচঃ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অনুক্রোশ-হৃদয়ঃ**—অত্যন্ত দয়ালু; **ভগবান্**—প্রভু; **আহ**—বলেছিলেন; **তান্**—প্রচেতাদের; **শিবঃ**—শিব; **বদ্ধ-অঞ্জলীন্**—কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান; **রাজ-পুত্রান্**—রাজপুত্রদের; **নারায়ণ-পরঃ**—নারায়ণের মহান্ ভক্ত শিব; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ভগবানের পরম ভক্ত, মহাপুরুষ শিব দয়াপরবশ হয়ে রাজপুত্রদের উপদেশ দিতে লাগলেন, এবং তাঁরাও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর সেই উপদেশ শ্রবণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শিব স্বেচ্ছায় রাজপুত্রদের আশীর্বাদ করার জন্য এবং তাঁদের হিতসাধনের জন্য সেখানে এসেছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, যাতে তা অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়, এবং তিনি রাজপুত্রদের সেই মন্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। কোন মন্ত্র যখন ভগবানের মহান ভক্তের দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখন মন্ত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী, তবুও দীক্ষার সময় শিষ্য শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন, কারণ শ্রীগুরুদেবের দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার ফলে, সেই মন্ত্র অধিক শক্তিসম্পন্ন হয়। শিব রাজপুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনতে, কারণ অনবধানে শ্রবণের ফলে নাম অপরাধ হয়।

শ্লোক ৩৩

শ্রীরুদ্র উবাচ

জিতং ত আত্মবিদ্বর্যস্বস্তয়ে স্বস্তিরস্তু মে ।
ভবতারাধসা রাদ্ধং সর্বস্মা আত্মনে নমঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রী-রুদ্রঃ উবাচ—শিব বললেন; **জিতম্**—জয় হোক; **তে**—আপনার; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **বর্য**—শ্রেষ্ঠ; **স্বস্তয়ে**—মঙ্গলময়কে; **স্বস্তিঃ**—কল্যাণ; **অস্তু**—হোক; **মে**—আমার; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **আরাধসা**—সর্বতোভাবে পূর্ণের দ্বারা; **রাদ্ধম্**—আরাধ্য; **সর্বস্মৈ**—পরম আত্মা; **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **নমঃ**—প্রণতি।

অনুবাদ

ভগবানের প্রার্থনা করে শিব বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক! সমস্ত আত্মবিৎ পুরুষদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আপনি সর্বদা তাঁদের কল্যাণসাধন করেন, তাই আপনি আমারও কল্যাণসাধন করুন। আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই আপনি আরাধ্য। আপনি হচ্ছেন পরমাত্মা; তাই আমি পুরুষোত্তমরূপে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করে শুরুতেই ভক্ত বলেন, "হে ভগবান! আপনার মহিমা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হোক।" ভগবানের মহিমা কীর্তন করা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত *আত্মবিৎ* পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই সম্বন্ধে বেদে (*কঠোপনিষদ* ২/২/১৩) বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* — পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকার চেতন জীব রয়েছে—তাদের কেউ এই জড় জগতে রয়েছে, এবং অন্যেরা চিৎ-জগতে রয়েছেন। যাঁরা চিৎ-জগতে রয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে *আত্মবিৎ*, কারণ চিন্ময় স্তরে জীব কখনও ভগবানের প্রতি তাঁর সেবার কথা বিস্মৃত হন না। তাই চিৎ-জগতে যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি এবং স্বতন্ত্র জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত। তাই সমস্ত *আত্মবিৎ* পুরুষদের মধ্যে ভগবানই হচ্ছেন পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । স্বতন্ত্র জীবাত্মা যখন পরম আত্মারূপে ভগবানকে

জেনে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানে স্থির হন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বমঙ্গলময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত হন। শিব এখানে প্রার্থনা করেছেন যে, তাঁর প্রতি ভগবানের কৃপার প্রভাবে, তিনি যেন চিরকাল তাঁর মঙ্গলময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

ভগবান পরম পূর্ণ, এবং তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, তাঁরাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে—*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ* । পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের উপদেশ দেন, যার ফলে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নতিসাধন করতে পারেন। তাঁরা যখন পরম পূর্ণের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে* । ভগবান সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত থাকেন, যার ফলে ভগবদ্ভক্ত ভক্তিমার্গে ক্রমশ উন্নতিসাধন করতে পারেন। ভগবান যেহেতু পরমাত্মা বা সর্বাত্মারূপে উপদেশ দেন, তাই শিব তাঁকে *সর্বস্মা আত্মনে নমঃ* বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। স্বতন্ত্র জীবকে বলা হয় *আত্মা,* এবং ভগবানকেও *আত্মা* বা পরমাত্মা বলা হয়। সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে, ভগবান পরম *আত্মা* নামে পরিচিত। তাই তাঁকে সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করা হয়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৮/২০) কুন্তীদেবীর প্রার্থনা বিচার করা যেতে পারে—

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্ ।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেমহি স্ত্রিয়ঃ ॥

ভগবান সর্বদা জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত পরমহংস বা সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তদের উপদেশ দিতে সব সময় প্রস্তুত। ভগবান সর্বদা এই প্রকার উন্নত স্তরের ভক্তদের বলে দেন, কিভাবে তাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকতে পারেন। তেমনই, আত্মারাম শ্লোকে (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৭/১০) উল্লেখ করা হয়েছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

আত্মারাম বলতে তাঁদের ইঙ্গিত করে, যাঁরা জড় জগতের প্রতি আসক্ত না হয়ে, কেবল আত্ম-উপলব্ধির বিষয়ে যুক্ত থাকেন। এই প্রকার আত্ম-তত্ত্ববিৎদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—নির্বিশেষ ও সবিশেষ। কিন্তু, ভগবানের সবিশেষ দিব্য গুণাবলীর প্রতি যখন নির্বিশেষবাদীরা আকৃষ্ট হন, তখন তাঁরাও ভক্তে পরিণত

হন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিব পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের ভক্তিতে স্থির থাকতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে যে, শিব কখনও নির্বিশেষবাদীদের মতো ভগবানের সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি মনে করেন যে, তিনি যদি ভগবদ্ভক্তিতে স্থির থাকতে পারেন, তা হলে সেটি হবে তাঁর পরম সৌভাগ্য। এই জ্ঞানের প্রভাবে জীব উপলব্ধি করতে পারেন যে, সমস্ত জীব, এমন কি শিব, ব্রহ্মা এবং অন্য সমস্ত দেবতারাও হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের দাস।

শ্লোক ৩৪

নমঃ পঙ্কজনাভায় ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মনে ।
বাসুদেবায় শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে ॥ ৩৪ ॥

নমঃ—আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **পঙ্কজ-নাভায়**—যাঁর নাভি থেকে সর্বলোকাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভূত-সূক্ষ্ম**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **আত্মনে**—উৎস; **বাসুদেবায়**—ভগবান বাসুদেবকে; **শান্তায়**—যিনি সর্বদা শান্ত; **কূট-স্থায়**—অপরিবর্তনীয়; **স্ব-রোচিষে**—স্বপ্রকাশ স্বরূপ।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার নাভিদেশ থেকে সর্বলোকাত্মক পদ্ম উত্থিত হয়েছে, তাই আপনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের পরম নিয়ন্তা, এবং আপনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত বাসুদেব। আপনি পরম শান্ত, এবং আপনার স্বপ্রকাশের ফলে, আপনি ছয় প্রকার বিকারের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভসমুদ্রে শয়ন করেন, এবং তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয়। সেই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্মা থেকে জড়-জাগতিক সৃষ্টি শুরু হয়। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের উৎস। যেহেতু শিব নিজেকে এই জড় সৃষ্টির একজন বলে মনে করছেন, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও পরম নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। হৃষীকেশ বা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর নামেও পরমেশ্বর ভগবান পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ভগবানেরই

সৃষ্টি। অতএব তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং তাঁর কৃপার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবায় সেগুলি নিযুক্ত করতে পারেন। বদ্ধ অবস্থায় জীব জড় সুখভোগের চেষ্টায় তার ইন্দ্রিয়গুলিকে যুক্ত করে এই জড় জগতে সংগ্রাম করে। কিন্তু জীব যদি ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারে। শিব বাসনা করেছেন যে, তিনি যেন জড় জগতের কলুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের চেষ্টায় বিপথগামী না হন; পক্ষান্তরে তিনি যেন সর্বদা তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারেন। সর্বব্যাপ্ত ভগবান বাসুদেবের কৃপা এবং সহযোগিতার প্রভাবে জীব তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অবিচলিতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারেন, ঠিক যেমন ভগবান অবিচলিতভাবে তাঁর কার্য করেন।

শান্তায় কূটস্থায় স্বরোচিষে বাক্যাংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান যদিও এই জড় জগতে রয়েছেন, তবুও তিনি কখনও সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গের দ্বারা বিচলিত হন না। কিন্তু, বদ্ধ জীবেরা ছয় প্রকার বিকারের দ্বারা বিচলিত হয়। সেই ছয়টি বিকার হচ্ছে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। বদ্ধ জীবেরা যদিও অতি সহজে জড় জগতের এই সমস্ত অবস্থাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু পরমাত্মা বা বাসুদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান কখনও এই সমস্ত বিকারের দ্বারা বিচলিত হন না। তাই এখানে তাঁকে *কূটস্থায়* বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বদাই শান্ত ও অবিচলিত। *স্বরোচিষে* শব্দটির দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দিব্য স্থিতির প্রভাবে স্বয়ং প্রকাশ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের জ্যোতির অন্তর্গত হলেও, তার ক্ষুদ্রত্বহেতু কখনও কখনও সেই জ্যোতির্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতিত হয়। যখন তার অধঃপতন হয়, তখন সে এই জড় জগতে বদ্ধ জীবনে প্রবেশ করে। ভগবান কিন্তু কখনও এইভাবে বদ্ধ হন না; তাই এখানে তাঁকে বলা হয়েছে স্বয়ং প্রকাশ বা *স্বরোচিষে* । তাই এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধ জীব যখন বাসুদেবের আশ্রয়ে থাকে অথবা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকে, তখন সে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৫

সঙ্কর্ষণায় সূক্ষ্মায় দুরন্তায়ান্তকায় চ ।
নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে ॥ ৩৫ ॥

সঙ্কর্ষণায়—জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতাকে; **সূক্ষ্মায়**—জড় উপাদানের সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপকে; **দুরন্তায়**—যাঁকে অতিক্রম করা যায় না তাঁকে; **অন্তকায়**—সংহারের অধিষ্ঠাতাকে; **চ**—ও; **নমঃ**—প্রণতি; **বিশ্ব-প্রবোধায়**—ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ সাধনের অধিষ্ঠাতাকে; **প্রদ্যুম্নায়**—প্রদ্যুম্নকে; **অন্তঃ-আত্মনে**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উৎস, সমস্ত জড় উপাদানের অধিষ্ঠাতা এবং সংহারকর্তা। আপনি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুম্ন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কর্ষণের পূর্ণ শক্তির দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে। জড় বৈজ্ঞানিকেরা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম আবিষ্কার করে থাকতে পারে, যা এই জড় জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন ও পালন করছে, কিন্তু তবুও সেই সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা তাঁর মুখাগ্নির দ্বারা সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনাকারী *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সমস্ত উপাদানের অধিষ্ঠাতা তাঁর সংহারকারী শক্তির দ্বারা এই জগতের সংহারকও। সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধিষ্ঠাতা, আর ভগবান বাসুদেবের আর একটি রূপ প্রদ্যুম্ন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি এবং পালনের অধিষ্ঠাতা। এই শ্লোকে *সূক্ষ্মায়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই স্থূল জড় শরীরের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম জড় শরীর রয়েছে। ভগবান তাঁর বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণরূপে এই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত উপাদানের পালন করেন। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, স্থূল জড় উপাদানগুলি হচ্ছে—মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ, এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলি হচ্ছে—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই সবই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্লোক ৩৬

নমো নমোঽনিরুদ্ধায় হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে ।
নমঃ পরমহংসায় পূর্ণায় নিভৃতাত্মনে ॥ ৩৬ ॥

নমঃ—আপনাকে আমি সর্বতোভাবে প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—পুনরায় প্রণতি নিবেদন করি; **অনিরুদ্ধায়**—অনিরুদ্ধকে; **হৃষীকেশ**—ইন্দ্রিয়ের-ঈশ্বর; **ইন্দ্রিয়-আত্মনে**—ইন্দ্রিয়ের পরিচালক; **নমঃ**—সর্বতোভাবে আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি; **পরম-হংসায়**—সূর্যরূপকে; **পূর্ণায়**—পরম পূর্ণকে; **নিভৃত-আত্মনে**—ক্ষয়-বৃদ্ধিশূন্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি ইন্দ্রিয় ও মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ। আপনি সূর্যরূপে তেজের দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করছেন, আপনার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই। তাই আমি বার বার আপনাকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

হৃষীকেশেন্দ্রিয়াত্মনে । মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছেন মনের অধিষ্ঠাতা। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ করতে হয়; তাই শিব মনের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধের প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং তার ফলে তিনি তাঁর মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) বলা হয়েছে—*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু* । ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হলে, মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে যুক্ত করতে হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) এও বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ*—ভগবান থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে। তাই অনিরুদ্ধ যদি প্রসন্ন হন, তা হলে তিনি মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে সাহায্য করেন। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অনিরুদ্ধের বিস্তার হচ্ছেন সূর্যদেব। যেহেতু সূর্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন অনিরুদ্ধের বিস্তার, তাই এই শ্লোকে শিব সূর্যদেবের প্রার্থনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) হচ্ছেন মানসিক ক্রিয়ার, অর্থাৎ চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ও ক্রিয়ার দেবতা। শিব অনিরুদ্ধকে সূর্যদেবরূপে প্রার্থনা করেছেন। অনিরুদ্ধ বাহ্য ভৌতিক তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, যে ভৌতিক তত্ত্বের দ্বারা এই শরীর গঠিত হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, *পরমহংস* শব্দটি হচ্ছে সূর্যদেবের আর একটি নাম। সূর্যদেবকে এখানে *নিভৃতাত্মনে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি সর্বদা বৃষ্টির দ্বারা বিভিন্ন গ্রহলোক পালন করেন। সূর্যদেব সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে মেঘে পরিণত করেন এবং সর্বত্র জল বিতরণ করেন। যখন যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়,

তখন অন্ন উৎপন্ন হয়, এবং সেই অন্ন প্রতিটি গ্রহের জীবদের পালন করে। সূর্যদেবকে এখানে *পূর্ণ* বলেও সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ সূর্যরশ্মি অন্তহীন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির সময় থেকে, কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যদেব তাপ ও আলোক বিতরণ করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে না। *পরমহংস* শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্মল। যখন প্রচুর পরিমাণে সূর্যের কিরণ নিঃসৃত হয়, তখন মন নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে, অর্থাৎ সূর্যদেব জীবের মনকে *পরমহংস* স্তরে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হন, যার ফলে তাঁর মন সর্বদা সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে এবং ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে। অগ্নি যেমন সমস্ত মলিন বস্তুকে শুদ্ধ করে, তেমনই সূর্যদেবও সব কিছুকে শুদ্ধ করেন, বিশেষ করে মনের কলুষকে, এবং এইভাবে মানুষকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেন।

শ্লোক ৩৭

স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ ।
নমো হিরণ্যবীর্যায় চাতুর্হোত্রায় তন্তবে ॥ ৩৭ ॥

স্বর্গ—স্বর্গলোক; **অপবর্গ**—মুক্তির পথ; **দ্বারায়**—দ্বারের; **নিত্যম্**—নিত্য; **শুচি-ষদে**—পরম পবিত্রকে; **নমঃ**—আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **বীর্যায়**—বীর্য; **চাতুঃ-হোত্রায়**—চাতুর্হোত্র নামক বৈদিক যজ্ঞ; **তন্তবে**—বিস্তারকারীকে।

অনুবাদ

হে ভগবান অনিরুদ্ধ! আপনার অধ্যক্ষতায় স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আপনি সর্বদা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি স্বর্ণসদৃশ বীর্যসমন্বিত, এবং তার ফলে অগ্নিরূপে আপনি চাতুর্হোত্র আদি বৈদিক যজ্ঞের সহায়তা করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

স্বর্গ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকসমূহ, এবং অপবর্গ মানে হচ্ছে 'মুক্তি'। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি আকৃষ্ট, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির তিনটি

গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। *ভগবদ্গীতায়* তাই বলা হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সকাম কর্মের স্তর অতিক্রম করা। বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি রয়েছে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। অনিরুদ্ধ সকাম কর্মীদের কেবল উচ্চতর লোকে উন্নীত হতেই সহায়তা করেন না, তিনি তাঁর অক্ষয় শক্তির দ্বারা ভক্তকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হতেও সহায়তা করেন। তাপ যেমন জড় শক্তির উৎস, তেমনই অনিরুদ্ধের অনুপ্রেরণা হচ্ছে সেই শক্তি, যার প্রভাবে মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৮

নম ঊর্জ ইষে ত্রয্যাঃ পতয়ে যজ্ঞরেতসে ।
তৃপ্তিদায় চ জীবানাং নমঃ সর্বরসাত্মনে ॥ ৩৮ ॥

নমঃ—আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি; **ঊর্জে**—পিতৃলোকের পোষককে; **ইষে**—সমস্ত দেবতাদের পোষককে; **ত্রয্যাঃ**—তিন বেদের; **পতয়ে**—প্রভুকে; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **রেতসে**—চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে; **তৃপ্তি-দায়**—যিনি সকলকে তৃপ্ত করেন, তাঁকে; **চ**—ও; **জীবানাম্**—জীবদের; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **সর্ব-রস-আত্মনে**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি পিতৃলোক ও দেবতাদেরও পোষক। আপনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং তিন বেদের প্রভু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যখন জীবের জন্ম হয়, বিশেষ করে মনুষ্যরূপে, তখন দেবতাদের প্রতি, ঋষিদের প্রতি এবং সাধারণ জীবদের প্রতি তার কতকগুলি ঋণ থাকে। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং-পিতৃণাম্* । এইভাবে পিতৃদের প্রতি, পূর্ব-পুরুষদের প্রতি মানুষের ঋণ থাকে। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যাতে তাঁকে শক্তি দান করেন, যার ফলে তিনি পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও জনসাধারণের ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৫/৪১)

কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তিনি দেবতা, ঋষি, পিতা, পূর্বপুরুষ ইত্যাদি সকলের কাছে তাঁর যে ঋণ রয়েছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে যান। শিব তাই অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যাতে তাঁকে শক্তি দেন, যার ফলে তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন।

চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সোম হচ্ছেন জীবের জিহ্বার দ্বারা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদানকারী দেবতা। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁকে শক্তি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রসাদ ছাড়া অন্য কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ না করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি শ্লোকে গেয়েছেন যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিভ হচ্ছে সব চাইতে ভয়ঙ্কর শত্রু। কেউ যদি তাঁর জিহ্বাকে সংযত করতে পারেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেন। জিহ্বাকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। শিব অনিরুদ্ধের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন, তা এই উদ্দেশ্যেই *(তৃপ্তিদায়)*; তিনি অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁকে কেবল ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতে সাহায্য করেন।

শ্লোক ৩৯

সর্বসত্ত্বাত্মদেহায় বিশেষায় স্থবীয়সে ।
নমস্ত্রৈলোক্যপালায় সহ ওজোবলায় চ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব—সমস্ত; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **আত্ম**—আত্মা; **দেহায়**—দেহকে; **বিশেষায়**—বিভিন্নতা; **স্থবীয়সে**—জড় জগৎকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবন; **পালায়**—পালক; **সহ**—সঙ্গে; **ওজঃ**—শক্তি; **বলায়**—বলকে; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি বিরাট স্বরূপ, যাতে সমস্ত জীবদের শরীর নিহিত রয়েছে। আপনি ত্রিলোকের পালক, এবং তার ফলে আপনি সেগুলির মধ্যে মন, ইন্দ্রিয়,

দেহ ও প্রাণবায়ু পালন করেন। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

জীবের শরীর যেমন অসংখ্য কোষ, কীটাণু ও জীবাণু দ্বারা গঠিত, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর সমস্ত জীবদের স্বতন্ত্র শরীরের দ্বারা গঠিত। শিব সমস্ত জীব শরীর-সমন্বিত বিরাট শরীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছেন, যাতে প্রত্যেকের শরীর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারে। জীবের শরীর যেহেতু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত, তাই সব কটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে, হাত ভগবানের মন্দির মার্জনে নিযুক্ত হতে পারে, ইত্যাদি। সমস্ত জীবের প্রাণবায়ু হওয়ার ফলে, ভগবান প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের পালক। তাই তিনি প্রতিটি জীবকে পূর্ণরূপে দৈহিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁর জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এইভাবে প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য তার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাণীর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২২/৩৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা ॥

কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনাও করেন, তবুও অনুমোদন ব্যতীত তা সম্ভব নয়। জীব কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে, তা প্রদর্শন করার জন্য শিব বিভিন্নভাবে তাঁর প্রার্থনায় নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ৪০

অর্থলিঙ্গায় নভসে নমোঽন্তর্বহিরাত্মনে ।
নমঃ পুণ্যায় লোকায় অমুষ্মৈ ভূরিবর্চসে ॥ ৪০ ॥

অর্থ—অর্থ; **লিঙ্গায়**—প্রকাশ করে; **নভসে**—আকাশকে; **নমঃ**—নমস্কার; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—এবং বাইরে; **আত্মনে**—আত্মাকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **পুণ্যায়**—পুণ্যকর্ম; **লোকায়**—সৃষ্টির জন্য; **অমুষ্মৈ**—মৃত্যুর পর; **ভূরি-বর্চসে**—পরম জ্যোতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি দিব্য বাণীর প্রসারের দ্বারা সব কিছুর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। আপনি অন্তর ও বাইরের সর্বব্যাপ্ত আকাশ, এবং আপনি জড়-জাগতিক ও জড়াতীত সমস্ত পুণ্যকর্মের চরম লক্ষ্য। আমি তাই বারবার আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রমাণকে বলা হয় *শব্দব্রহ্ম* । এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যা আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের শব্দপ্রমাণ অভ্রান্ত। *বেদকে* বলা হয় *শব্দব্রহ্ম,* কারণ বৈদিক প্রমাণ হচ্ছে চরম জ্ঞান। তার কারণ *শব্দব্রহ্ম* বা *বেদ* ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। *শব্দব্রহ্মের* প্রকৃত সারমর্ম কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। এই দিব্য ধ্বনি উচ্চারণের ফলে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বস্তুর অর্থ প্রকাশিত হয়। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রত্যেক বস্তুর অর্থ প্রকাশ হয়, বায়ুর মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দের ধ্বনির দ্বারা। সেই ধ্বনি জড় হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু শব্দ ব্যতীত কোন কিছুর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *বেদে* বলা হয়েছে, *অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যায় নারায়ণঃ স্থিতঃ*—"নারায়ণ সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত।" *ভগবদ্গীতাতেও* (১৩/৩৪) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥

"হে ভারত! এক সূর্য যেমন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করে, তেমনই জীবাত্মা ও পরমাত্মা চেতনার দ্বারা সমগ্র দেহকে প্রকাশিত করে।"

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই চেতনা সর্বব্যাপ্ত। জীবের সীমিত চেতনা কেবল তার জড় শরীরটি জুড়ে ব্যাপ্ত, আর ভগবানের পরম চেতনা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। জীবাত্মা দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে বলেই সারা শরীর জুড়ে চেতনা ব্যাপ্ত রয়েছে; তেমনই, পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের চেতনা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে বলে সব কিছু যথাযথভাবে ক্রিয়া করছে। *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কৌন্তেয়! আমারই অধ্যক্ষতায় এই জড়া প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে, এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের উৎপন্ন করছে।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/১০)

শিব তাই পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, যাতে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, আমরা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগতেরই সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। এই সূত্রে *অমুষ্মৈ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হওয়ার পর সর্বোৎকৃষ্ট যে লক্ষ্য তাকে ইঙ্গিত করে। যারা সকাম কর্মে যুক্ত (কর্মী), তারা তাদের পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে উচ্চতরলোক প্রাপ্ত হয়। আর যারা জ্ঞানী, অর্থাৎ যারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় কৈবল্য বা সাযুজ্য লাভ করতে চায়, তারাও চরমে তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চরম স্তরে রয়েছেন ভগবদ্ভক্ত, যিনি ভগবানের সঙ্গলাভ করতে চান, তিনি বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১২) ভগবানকে *পবিত্রং পরমম্* বা পরম পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই কথা এই শ্লোকেও প্রতিপন্ন হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যে-সমস্ত গোপবালকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেছিলেন, তাঁরা কোন সাধারণ জীব ছিলেন না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যের ফলে, মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যেহেতু পবিত্র আত্মাই কেবল তাঁকে প্রাপ্ত হতে পারেন, তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পবিত্র।

শ্লোক ৪১

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় পিতৃদেবায় কর্মণে ।
নমোঽধর্মবিপাকায় মৃত্যবে দুঃখদায় চ ॥ ৪১ ॥

প্রবৃত্তায়—প্রবৃত্তি; **নিবৃত্তায়**—নিবৃত্তি; **পিতৃ-দেবায়**—পিতৃলোকের অধীশ্বরকে; **কর্মণে**—সকাম কর্মের ফলকে; **নমঃ**—নমস্কার; **অধর্ম**—অধর্ম; **বিপাকায়**—ফলকে; **মৃত্যবে**—মৃত্যুকে; **দুঃখ-দায়**—সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান্! আপনি পুণ্যকর্মের ফল দর্শনকারী। আপনি প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও তাদের পরিণাম। আপনি অধর্মজনিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কারণ, অতএব আপনি মৃত্যু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তাঁর থেকে জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উদয় হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি, এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতির উদয় হয়।"

ভগবান অসুরদের তাঁর কথা ভুলিয়ে দেন এবং তাঁর ভক্তদের তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মানুষের নিবৃত্তির কারণও হচ্ছেন ভগবান। *ভগবদ্গীতার* (১৬/৭) বর্ণনা অনুসারে, *প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ*—অসুরেরা জানে না কিভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং কোন্ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। অসুরেরা যে ভগবদ্ভক্তির বিরোধিতা করে, সেই সম্বন্ধে বুঝতে হবে যে, তাদের সেই প্রবৃত্তির কারণও ভগবান। অসুরেরা যেহেতু ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্ত হতে চায় না, তাই তাদের অন্তর থেকে ভগবান তাদের তাঁকে বিস্মৃত হওয়ার বুদ্ধি প্রদান করেন। কর্মীরা সাধারণত পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ* — "যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা দেবতাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে, আর যারা পিতৃদের পূজা করে, তারা পিতৃলোকে গমন করবে।"

এই শ্লোকে *দুঃখদায়* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যারা অভক্ত, তাদের নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপ করা হয়। সেই অবস্থাটি অত্যন্ত দুঃখদায়ক। জীব যেহেতু তার কর্ম অনুসারে তার জীবনের স্থিতি লাভ করে, তাই অসুর বা অভক্তরা অত্যন্ত দুঃখদায়ক পরিস্থিতিতে প্রক্ষিপ্ত হয়।

শ্লোক ৪২

নমস্ত আশিষামীশ মনবে কারণাত্মনে ।
নমো ধর্মায় বৃহতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে ।
পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ ॥ ৪২ ॥

নমঃ—প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **আশিষাম্ ঈশ**—হে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ প্রদানকারী; **মনবে**—পরম মন অথবা পরম মনুকে; **কারণ-আত্মনে**—সর্ব-কারণের পরম কারণকে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি; **ধর্মায়**—যিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎ তাঁকে; **বৃহতে**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **অকুণ্ঠ-মেধসে**—যাঁর মেধা কখনও প্রতিহত হয় না; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **পুরাণায়**—প্রবীণতমকে; **সাংখ্য-যোগ-ঈশ্বরায়**—সাংখ্য-যোগতত্ত্বের ঈশ্বরকে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

হে ভগবান্! আপনি সমস্ত আশীর্বাদ প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রবীণতম এবং সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভোক্তা। আপনি সমগ্র জগতের সাংখ্যযোগ-দর্শনের ঈশ্বর, কারণ আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনি সমস্ত ধর্মতত্ত্বের পরম ঈশ্বর, পরম মন এবং আপনার মেধা কখনও কোন পরিস্থিতিতে প্রতিহত হয় না। তাই বারবার আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণায় অকুণ্ঠ-মেধসে* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনিশ্চয়তার তত্ত্ব (Theory of uncertainty) আবিষ্কার করে তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবের মস্তিষ্কের এমন কোন ক্রিয়া থাকতে পারে না, যা স্থান ও কালের সীমার দ্বারা প্রতিহত হয় না। জীবকে বলা হয় অণু, পরম আত্মার একটি অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক অংশ, এবং তাই তার মস্তিষ্কও অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ধারণ করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মস্তিষ্কও সীমিত। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন এবং করেন, তা কখনও কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৬) ভগবান বলেছেন—

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

"হে অর্জুন! অতীতে যা কিছু হয়েছে, বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে, পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি তা সবই জানি। আমি সমস্ত জীবদেরও জানি; কিন্তু আমাকে কেউই জানে না।"

শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু জানেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে কেউই জানতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রতিনিধির পক্ষে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের (Theory of uncertainty) কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন তা পূর্ণ ও নিশ্চিত, এবং তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সর্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য। আর শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেন, সেই সম্বন্ধে যিনি যথাযথভাবে অবগত, তাঁর কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *ভগবদ্গীতা যথাযথের* ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী, এবং যারা এই আন্দোলনে যুক্ত, তাদের পক্ষে অনিশ্চয়তার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণকে *আশিষাম্ ঈশ* বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মহাপুরুষেরা, ঋষিরা ও দেবতারা সাধারণ জীবদের বরদান করতে সক্ষম, কিন্তু তাঁরা নিজেরাই আবার পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে বরলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে, কেউই অন্য কাউকে বরদান করতে পারে না। *মনবে* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম মনুকে'। বৈদিক শাস্ত্রে পরম মনু বা প্রথম মনু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার স্বায়ম্ভুব মনু। সমস্ত মনু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন অবতার *(মন্বন্তর-অবতার)* । ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দজন মনু, একমাসে চারশ কুড়িজন মনু, এবং এক বছরে ৫,০৪০ জন মনু, এবং তাঁর সারা জীবনে ৫,০৪,০০০ মনু রয়েছেন। যেহেতু সমস্ত মনুরা হচ্ছেন মানব-সমাজের পরিচালক, তাই চরমে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মানব-সমাজের পরম পরিচালক। *মনবে* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে সব রকম মন্ত্রের সিদ্ধি। মন্ত্র বদ্ধ-জীবদের ভববন্ধন থেকে উদ্ধার করে; তাই কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে, জীব যে-কোন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে।

কারণাত্মনে—সব কিছুরই একটি কারণ রয়েছে। ঘটনাক্রমে জগতের উৎপত্তির মতবাদটি এই শ্লোকে খণ্ডন করা হয়েছে। যেহেতু সব কিছুরই একটি কারণ রয়েছে, তাই ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু তথাকথিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাই তারা মূর্খের মতো বলে যে, সব কিছু ঘটছে ঘটনাক্রমে। *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাই এখানে তাঁকে *কারণাত্মনে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং সব কিছুর আদি কারণ, মূল ও বীজ। *বেদান্ত-সূত্রে* (১/১/২) যাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—পরম সত্য হচ্ছেন সমস্ত প্রকাশের পরম কারণ।

এখানে *সাংখ্য-যোগেশ্বরায়* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বা সমস্ত যোগশক্তির ঈশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচিন্ত্য যোগশক্তি ব্যতীত কাউকে ভগবান বলে স্বীকার করা যায় না। এই কলিযুগে যাদের অল্প একটু যোগশক্তি রয়েছে, তারা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করছে, কিন্তু এই সমস্ত নকল ভগবানেরা কেবল মূর্খদের কাছ থেকেই স্বীকৃতি লাভ করে, কারণ একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সমস্ত যোগশক্তি ও যোগসিদ্ধি-সমন্বিত। বর্তমান কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে সাংখ্য-যোগপদ্ধতি, তার প্রবর্তন করেছে নিরীশ্বরবাদী কপিল, কিন্তু প্রকৃত সাংখ্য-যোগপদ্ধতির প্রবর্তক হচ্ছেন

শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার কপিলদেব, যিনি ছিলেন দেবহূতির পুত্র। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের আর এক অবতার দত্তাত্রেয়ও সাংখ্য-যোগপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সাংখ্য-যোগপদ্ধতি ও যোগশক্তির আদি উৎস।

পুরুষায় পুরাণায় শব্দ দুটিও বিশেষভাবে বিচার্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণকে *আদি-পুরুষ* বলে স্বীকার করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণকে *পুরাণ-পুরুষ* বলে স্বীকার করা হয়েছে। যদিও তিনি সকলের মধ্যে সব চাইতে প্রবীণ, তবুও তিনি হচ্ছেন নবযৌবন-সম্পন্ন। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ধর্মায়* । যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ধর্মনীতির মূল প্রবর্তক, তাই বলা হয়েছে—*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবদ্-প্রণীতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/১৯)। কেউই কোন নতুন ধরনের ধর্ম প্রবর্তন করতে পারে না, কারণ ধর্ম ইতিমধ্যেই রয়েছে, এবং তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ মূল ধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে, সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করতে আমাদের বলেছেন। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। *মহাভারতেও* বলা হয়েছে—

যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥

এর অর্থ হচ্ছে যে যিনি সঠিকভাবে *বেদ* অধ্যয়ন করেছেন, যিনি প্রকৃত বিপ্র অথবা বেদজ্ঞ, এবং যিনি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থই অবগত, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসরণ করাকেই জীবের সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা করেন। অতএব শিবও এখানে আমাদের সনাতন ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করছেন।

শ্লোক ৪৩

শক্তিত্রয়সমেতায় মীঢুষেঽহঙ্কৃতাত্মনে ।
চেতআকূতিরূপায় নমো বাচোবিভূতয়ে ॥ ৪৩ ॥

শক্তি-ত্রয়—তিন প্রকার শক্তি; **সমেতায়**—উৎসকে; **মীঢুষে**—রুদ্রকে; **অহঙ্কৃত-আত্মনে**—অহঙ্কারের উৎস; **চেতঃ**—জ্ঞান; **আকূতি**—কর্ম করার ঔৎসুক্য; **রূপায়**—রূপকে; **নমঃ**—আমার প্রণতি; **বাচঃ**—বাণীকে; **বিভূতয়ে**—বিভিন্ন প্রকার ঐশ্বর্যকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি কর্তা, করণ ও কর্মের পরম নিয়ন্তা। তাই আপনি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। আপনি অহঙ্কারের পরম নিয়ন্তা রুদ্র। আপনিই হচ্ছেন জ্ঞান ও বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্মের উৎস।

তাৎপর্য

সকলেই অহঙ্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করে। তাই শিব পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার মাধ্যমে অহঙ্কারকে পবিত্র করার চেষ্টা করছেন। যেহেতু শিব বা রুদ্র হচ্ছেন অহঙ্কারের নিয়ন্তা, তাই তিনি ভগবানের কৃপার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শুদ্ধ হতে চাইছেন, যাতে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জাগ্রত হতে পারে। রুদ্র অবশ্য সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জাগ্রত, কিন্তু তিনি আমাদের লাভের জন্য এইভাবে প্রার্থনা করছেন। নির্বিশেষবাদীদের কাছে শুদ্ধ স্বরূপ হচ্ছে *অহং ব্রহ্মাস্মি*—"আমি এই শরীর নই; আমি আত্মা।" কিন্তু তার প্রকৃত স্থিতিতে আত্মাকে ভগবদ্ভক্তির কার্য অনুষ্ঠান করতে হয়। তাই শিব প্রার্থনা করেছেন, যাতে তাঁর মন ও কর্ম উভয়ই বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত হতে পারে। এটিই হচ্ছে অহঙ্কারকে শুদ্ধ করার পন্থা। *চেতঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জ্ঞান'। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত যথাযথভাবে কর্ম করা যায় না। জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছে *বাচঃ* বা বেদের বাণী। এখানে *বাচঃ* শব্দটি বেদের বাণীকে বোঝাচ্ছে। সৃষ্টির উৎস হচ্ছে শব্দ, এবং শব্দ যদি শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তা হলে পূর্ণ জ্ঞান ও যথাযথ কর্ম প্রকাশিত হবে। তা সম্ভব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করার মাধ্যমে। এইভাবে শিব বারংবার প্রার্থনা করেছেন, *বেদের* পবিত্র নির্দেশ অনুসারে, তাঁর জ্ঞান ও কার্যকলাপের পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে, যাতে তাঁর দেহ, মন ও কার্যকলাপ শুদ্ধ হতে পারে। শিব পরমেশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও বাণী কেবল ভক্তির প্রতি উন্মুখ হয়।

শ্লোক ৪৪

দর্শনং নো দিদৃক্ষূণাং দেহি ভাগবতার্চিতম্ ।
রূপং প্রিয়তমং স্বানাং সর্বেন্দ্রিয়গুণাঞ্জনম্ ॥ ৪৪ ॥

দর্শনম্—দর্শন; **নঃ**—আমাদের; **দিদৃক্ষূণাম্**—দর্শনাভিলাষী; **দেহী**—দয়া করে প্রদর্শন করুন; **ভাগবত**—ভক্তদের; **অর্চিতম্**—তাঁদের দ্বারা যেভাবে পূজিত; **রূপম্**—রূপ; **প্রিয়-তমম্**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়; **স্বানাম্**—আপনার ভক্তদের; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **গুণ**—গুণ ; **অঞ্জনম্**—অত্যন্ত মনোহর।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমি আপনার সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তরা আরাধনা করেন। আপনার অন্য বহু রূপ রয়েছে, কিন্তু আমি

বিশেষভাবে সেই রূপ দর্শন করতে চাই, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। দয়া করে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, সেই রূপ প্রদর্শন করুন, কারণ ভক্তদের আরাধ্য সেই রূপই কেবল ইন্দ্রিয়ের সমস্ত আবেদনগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রুতি বা বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরম সত্য হচ্ছে *সর্ব-কামঃ সর্ব-গন্ধঃ সর্ব-রসঃ,* অথবা, পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি *রসো বৈ সঃ,* অর্থাৎ, তিনি সমস্ত আস্বাদনীয় সম্পর্কের (রসের) উৎস। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় রয়েছে—দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, ইত্যাদি, এবং ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমস্ত প্রবণতাগুলি তৃপ্ত হয়ে যায়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—"ভক্তির অর্থ হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের সেবায় যুক্ত করা।" *(নারদ-পঞ্চরাত্র)* আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গুলি কিন্তু কখনও ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে না; তাই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হতে হয়। *সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তম্ তৎপরত্বেন নির্মলম্* । সমস্ত উপাধি বা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ হতে হয়। আমরা যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করি, তখন ইন্দ্রিয়ের বাসনা বা প্রবণতাগুলি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়। শিব তাই ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চেয়েছেন, যা বৌদ্ধ দার্শনিকদের চিন্তার অতীত।

নির্বিশেষবাদী ও শূন্যবাদীদেরও পরম সত্যের রূপ দর্শন করতে হয়। বৌদ্ধ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মূর্তি থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব মন্দিরে ভগবান যেভাবে পূজিত হন (যেমন রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ), সেইভাবে তাঁদের পূজা করা হয় না। বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাধাকৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হয়। শিব ভগবানের পূর্ণরূপ সেইভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে ভক্তরা তা দেখতে চান। *রূপং প্রিয়তমং স্বানাম্* শব্দগুলি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করছে যে, শিব ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চান, যা ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়। *স্বানাম্* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভক্তরাই কেবল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। জ্ঞানী, যোগী ও কর্মীরা ভগবানের ততটা প্রিয় নয়, কারণ কর্মীরা তাদের আবশ্যকতাগুলির সরবরাহকারীরূপে ভগবানকে দেখতে চায়, জ্ঞানীরা তাঁকে দর্শন করতে চায়, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য, এবং যোগীরা তাঁকে হৃদয়ে আংশিকভাবে প্রকাশমান পরমাত্মারূপে দর্শন করতে চায়, কিন্তু ভক্তেরা তাঁকে তাঁর পূর্ণ স্বরূপে দর্শন করতে চান। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে—

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি বংশীবদনে অত্যন্ত নিপুণ, যাঁর নয়ন প্রস্ফুটিত কমল-দলের মতো, যাঁর মস্তক শিখিপুচ্ছের দ্বারা অলংকৃত, যাঁর সুন্দর রূপ বর্ষার জলভরা মেঘের মতো নীলবর্ণ, এবং যাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য কোটি কোটি কামদেবকে মোহিত করে।" এই বর্ণনা অনুসারে, এইভাবে শিব ভগবানকে দর্শন করতে চেয়েছেন—অর্থাৎ ভক্তদের কাছে তিনি যেভাবে প্রকাশিত হন, সেইভাবে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাৎপর্য এই যে, শিব ভগবানকে তাঁর পূর্ণ স্বরূপে দর্শন করতে চেয়েছিলেন, নির্বিশেষবাদী বা শূন্যবাদীদের মতো তাঁকে দর্শন করতে চাননি। ভগবান যদিও তাঁর বিবিধরূপে এক *(অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদিম্)*, তবুও গোপীজন-বল্লভরূপে ও গোপ-বালকদের সখারূপে তাঁর কৈশোর মূর্তি তাঁর পরম পূর্ণস্বরূপ। তাই বৈষ্ণবগণ ভগবানের বৃন্দাবন-লীলার রূপটিকে তাঁর সর্বপ্রধান স্বরূপ বলে মনে করেন।

শ্লোক ৪৫-৪৬

স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামং সর্বসৌন্দর্যসংগ্রহম্ ।
চার্বায়তচতুর্বাহু সুজাতরুচিরাননম্ ॥ ৪৫ ॥
পদ্মকোশপলাশাক্ষং সুন্দরভ্রু সুনাসিকম্ ।
সুদ্বিজং সুকপোলাস্যং সমকর্ণবিভূষণম্ ॥ ৪৬ ॥

স্নিগ্ধ—স্নিগ্ধ; **প্রাবৃট্**—বর্ষা ঋতু; **ঘন-শ্যামম্**—নিবিড় মেঘের মতো; **সর্ব**—সমস্ত; **সৌন্দর্য**—সৌন্দর্য; **সংগ্রহম্**—সংগ্রহ; **চারু**—সুন্দর; **আয়ত**—আয়ত; **চতুঃ-বাহু**—চতুর্ভুজ; **সু-জাত**—অত্যন্ত সুন্দর; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **আননম্**—মুখ; **পদ্ম-কোশ**—পদ্মফুলের কোরক; **পলাশ**—পাপড়ি; **অক্ষম্**—চক্ষু; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রু**—ভ্রূ; **সু-নাসিকম্**—উন্নত নাসিকা; **সু-দ্বিজম্**—সুন্দর দাঁত; **সু-কপোল**—সুন্দর কপোল; **আসয়ম্**—মুখ; **সম-কর্ণ**—সমানভাবে সুন্দর কর্ণযুগল; **বিভূষণম্**—সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত।

অনুবাদ

ভগবানের রূপ বর্ষার সুস্নিগ্ধ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। বর্ষার ধারা যেমন স্নিগ্ধ, তাঁর দেহের সৌন্দর্যও তেমন স্নিগ্ধ। নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। ভগবানের চতুর্ভুজ ও পদ্ম-পলাশের মতো নেত্রসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল অপূর্ব সুন্দর। তাঁর নাসিকা উন্নত, তাঁর হাসি অত্যন্ত মনোহর, তাঁর কপোল অত্যন্ত সুন্দর এবং সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত তাঁর কর্ণযুগল সমানভাবে সুন্দর।

তাৎপর্য

গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর, আকাশে যখন ঘন কালো মেঘ দেখা যায়, তখন তা মনকে মুগ্ধ করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*বর্হাবতংসম্ অসিতাম্বুদ-সুন্দরাঙ্গম্* । ভগবান তাঁর কেশে ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করেন, আর তাঁর অঙ্গকান্তি ঠিক বর্ষার জলভরা মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। তাঁর রূপ অত্যন্ত সুন্দর এবং স্নিগ্ধ। *কন্দর্প-কোটি-কমনীয়* । কৃষ্ণের সৌন্দর্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, কোটি-কোটি কন্দর্পের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা চলে না। বিষ্ণুরূপে ভগবানের রূপ সমস্ত ঐশ্বর্যে বিভূষিত; শিব তাই নারায়ণ বা বিষ্ণুর সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী রূপ দর্শন লাভের বাসনা করছেন। সাধারণত ভগবানের আরাধনা শুরু হয় নারায়ণ বা বিষ্ণুর আরাধনার মাধ্যমে, আর কৃষ্ণ ও রাধার আরাধনা সব চাইতে গোপনীয়। ভগবান নারায়ণের আরাধনা হয় পাঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা, আর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা হয় ভাগবত-বিধির দ্বারা। পাঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা না করে, কেউ ভাগবত-বিধির দ্বারা ভগবানের পূজা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নবীন ভক্তরা পাঞ্চরাত্রিক-বিধির দ্বারা বা *নারদ-পঞ্চরাত্রে* যে-সমস্ত বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা ভগবানের পূজা করেন। নবীন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারে না; তাই মন্দিরে বিধি-বিধানের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা হয়। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ থাকলেও, নবীন ভক্তরা প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে থাকেন। পাঞ্চরাত্রিক-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় বিধিমার্গ, আর ভাগবত-বিধি অনুসারে আরাধনাকে বলা হয় রাগমার্গ। রাগমার্গ সেই সমস্ত ভক্তদের জন্য, যাঁরা বৃন্দাবনের স্তরে উন্নীত হয়েছেন।

ব্রজবাসীরা—গোপিকারা, মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, গোপবালক, গাভী ও অন্য সকলে—প্রকৃতপক্ষে রাগমার্গ বা ভাগবত-মার্গের স্তরে রয়েছেন। তাঁরা মূলত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য ও শান্ত—এই পাঁচটি রসে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু যদিও ভাগবত-মার্গে এই পাঁচটি রস রয়েছে, তবুও বিশেষভাবে বাৎসল্য ও মাধুর্যেরই

প্রাধান্য বেশি। তবুও গোপবালকেরা বিপ্রলম্ভ সখ্যে বা উন্নততর সখ্য-রসে ভগবানের আরাধনা করেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকদের মধ্যে সখ্য রয়েছে, তবুও এই সখ্য কৃষ্ণ ও অর্জুনের ঐশ্বর্যপর সখ্য থেকে ভিন্ন। অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একজন সাধারণ সখার মতো আচরণ করার ফলে ভীত হয়েছিলেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপ-বালকেরা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা সমকক্ষের মতো আচরণ করেন, ঠিক যেভাবে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন, এবং তাঁরা কখনই তাঁর ভয়ে ভীত নন, অথবা তাঁরা কখনও তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন না। এইভাবে রাগমার্গ বা ভাগবত-মার্গে কৃষ্ণের সঙ্গে উন্নততর স্তরের সখ্য রয়েছে, যথা বিপ্রলম্ভ সখ্য। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভগবানের সেবা বৃন্দাবনে রাগমার্গে দেখা যায়।

পাঞ্চরাত্রিক-বিধির নির্দেশ অনুসারে, বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে, কিছু অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তি এক লাফে রাগমার্গে উঠতে চায়। এই প্রকার ব্যক্তিদের বলা হয় সহজিয়া। কিছু আসুরিক ব্যক্তিও রয়েছে যারা গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করে তাদের জঘন্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। এই সমস্ত অসুরেরা, যারা রাগমার্গ সম্বন্ধে গান লিখে বই ছাপায়, তারা নিশ্চিতভাবে নরকের মার্গে এগিয়ে চলেছে। দুর্ভাগ্যবশত তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও সেই পথে টেনে নিয়ে যায়। কৃষ্ণভক্তদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সমস্ত অসুরদের সঙ্গ বর্জন করা উচিত। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে বিধিমার্গ অনুসরণ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের আরাধনা করা উচিত, যদিও মন্দিরে ভগবান রাধাকৃষ্ণরূপে বিরাজমান থাকতে পারেন। রাধাকৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণও রয়েছেন; তাই কেউ যখন বিধিমার্গে ভগবানের আরাধনা করেন, তখন ভগবান লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের বিধিমার্গে সেবা করার সমস্ত নির্দেশ পূর্ণরূপে দেওয়া হয়েছে। বিধিমার্গে সেবার ক্ষেত্রে যদিও চৌষট্টি প্রকার অপরাধ রয়েছে, কিন্তু রাগমার্গে এই সমস্ত অপরাধের বিচার নেই, কারণ সেই স্তরের ভক্ত এত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হন যে, অপরাধের তখন আর কোন প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু আমরা যদি বিধিমার্গ অনুসরণ না করে, অপরাধের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন না হই, তা হলে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনা করে শিব *চার্বায়ত-চতুর্বাহু সুজাত-রুচিরাননম্* পদটি

ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণুর সুন্দর চতুর্ভুজের বর্ণনা করেছেন। যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁরা তাঁকে *সুজাত-রুচিরাননম্* বলে বর্ণনা করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে ভগবানের লক্ষ-লক্ষ রূপ রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ হচ্ছে সব চাইতে সুন্দর। তাই যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁদের জন্য *সুজাত-রুচিরাননম্* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণুর চারটি হাতের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর যে দুটি হাতে তিনি পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন, সেগুলি ভক্তদের জন্য, এবং অপর দুটি হাত, যাতে তিনি চক্র ও গদা ধারণ করেন, সেগুলি অসুরদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সব কটি হাতই মঙ্গলময়, তা তিনি শঙ্খ ও ফুল অথবা গদা ও চক্র যা-ই ধারণ করুন না কেন। বিষ্ণুর চক্র ও গদার দ্বারা নিহত অসুরেরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়, ঠিক যেভাবে ভগবানের ভক্তরা পদ্ম ও শঙ্খ ধারণকারী হস্তের দ্বারা রক্ষিত হন। কিন্তু অসুরেরা চিৎ-জগতে উন্নীত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করে, কিন্তু ভক্তরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন। আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁরা অচিরেই গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন।

ভগবানের সৌন্দর্য বর্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হয়, তখন তা মানুষের কাছে অধিক থেকে অধিকতর মনোহর বলে মনে হয়। গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপের পর, বর্ষা ঋতু মানুষের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। বস্তুতপক্ষে, গ্রামের লোকেরা তখন তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, সেই বর্ষার ধারা উপভোগ করে। তাই ভগবানের দেহের সৌন্দর্যকে বর্ষার জলভরা মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভক্তরা ভগবানের সৌন্দর্য উপভোগ করেন, কারণ তা হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি। তাই এখানে *সর্ব-সৌন্দর্য-সংগ্রহম্* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে না যে, ভগবানের শরীরের কোন অঙ্গ কম সুন্দর। তা সর্বতোভাবে *পূর্ণম্*। সব কিছুই পূর্ণ—ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের সৌন্দর্য এবং ভগবানের অঙ্গসৌষ্ঠব। এই সবই এত পূর্ণ যে, কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে, তখন তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে যায়। *সর্ব-সৌন্দর্য* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, জড় জগৎ ও চিৎ-জগতে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত সৌন্দর্য ভগবানের মধ্যে রয়েছে। জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয়েই ভগবানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। যেহেতু ভগবান সুর ও অসুর, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী, সকলকেই আকর্ষণ করেন, তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। তেমনই তাঁর ভক্তরাও সকলকে আকর্ষণ করেন। *ষড়্-গোস্বামী-স্তোত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—*ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ*—গোস্বামীরা ধীর (ভক্ত) ও অধীর (অসুর) উভয়ের

কাছেই সমান প্রিয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তিনি অসুরদের কাছে খুব একটা প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু ষড়্গোস্বামীরা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তাঁরা অসুরদেরও প্রিয় ছিলেন। তাঁর ভক্তের সঙ্গে আচরণে এটিই হচ্ছে ভগবানের বৈশিষ্ট্য। ভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের নিজের থেকেও বেশি কৃতিত্ব প্রদান করেন। যেমন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করেননি, তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং এইভাবে যুদ্ধ জয়ের সমস্ত কৃতিত্ব তিনি অর্জুনকে দান করেছেন। *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্* —"হে সব্যসাচী (অর্জুন)! এই যুদ্ধে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১১/৩৩) ভগবান সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব অর্জুনকে দেওয়া হয়েছিল। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সব কিছুই ঘটছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার সমস্ত কৃতিত্ব দিচ্ছেন তাঁর ঐকান্তিক সেবকদের। এইভাবে ভগবানকে এখানে *সর্ব-সৌন্দর্য-সংগ্রহম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭-৪৮

প্রীতিপ্রহসিতাপাঙ্গমলকৈ রূপশোভিতম্ ।
লসৎপঙ্কজকিঞ্জল্কদুকূলং মৃষ্টকুণ্ডলম্ ॥ ৪৭ ॥
স্ফুরৎকিরীটবলয়হারনূপুরমেখলম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমালামণ্যুত্তমর্দ্ধিমৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রীতি—অনুগ্রহপূর্ণ; **প্রহসিত**—হাস্যোজ্জ্বল; **অপাঙ্গম্**—তির্যক দৃষ্টিপাত; **অলকৈঃ**—কুঞ্চিত কেশের দ্বারা; **রূপ**—সৌন্দর্য; **শোভিতম্**—সুশোভিত; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **পঙ্কজ**—পদ্মফুলের; **কিঞ্জল্ক**—কেশর; **দুকূলম্**—বস্ত্র; **মৃষ্ট**—উজ্জ্বল; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডল; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **কিরীট**—মুকুট; **বলয়**—কঙ্কণ; **হার**—কণ্ঠহার; **নূপুর**—নূপুর; **মেখলম্**—মেখলা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্ম**—পদ্ম; **মালা**—মালা; **মণি**—মণি; **উত্তম**—সর্বোত্তম; **ঋদ্ধিমৎ**—সেই কারণে আরও অধিক সুন্দর।

অনুবাদ

তাঁর উদার ও প্রীতিপূর্ণ হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি নেত্রান্ত থেকে তির্যকভাবে দৃষ্টিপাতের ফলে, ভগবান অপূর্ব সুন্দর। তাঁর কৃষ্ণ কেশদাম কুঞ্চিত, এবং

পদ্মফুলের কেশরের মতো তাঁর পীতবর্ণ বসন বায়ুর মধ্যে উড়ছে। তাঁর উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল, মুকুট, বলয়, হার, নূপুর, মেখলা এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সহ অন্যান্য অলংকারসমূহ তাঁর বক্ষের কৌস্তুভ-মণির স্বাভাবিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে।

তাৎপর্য

প্রহসিতাপাঙ্গ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি, বিশেষ করে ব্রজগোপিকাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাতকে ইঙ্গিত করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজগোপিকাদের হৃদয়ে মাধুর্য-রসের অনুভূতি বৃদ্ধি করেন, তখন তিনি সর্বদা হাস্য মুদ্রায় থাকেন। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম তাঁর হাতে অথবা হাতের তালুতে দেখা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, হাতের তালুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন মহাপুরুষের লক্ষণ, বিশেষ করে তা পরমেশ্বর ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ৪৯

সিংহস্কন্ধত্বিষো বিভ্রৎসৌভগগ্রীবকৌস্তুভম্ ।
শ্রিয়ানপায়িন্যা ক্ষিপ্তনিকষাশ্মোরসোল্লসৎ ॥ ৪৯ ॥

সিংহ—সিংহ; **স্কন্ধ**—স্কন্ধ; **ত্বিষঃ**—কুঞ্চিত কেশ; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **সৌভগ**—ভাগ্যশালী; **গ্রীব**—গলা; **কৌস্তুভম্**—কৌস্তুভ-মণি; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য; **অনপায়িন্যা**—অচঞ্চলা; **ক্ষিপ্ত**—পরাভূত করে; **নিকষ**—কষ্টিপাথর; **অশ্ম**—পাথর; **উরসা**—বক্ষের দ্বারা; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল।

অনুবাদ

ভগবানের স্কন্ধদেশ ঠিক সিংহের মতো। সেই স্কন্ধদেশে ফুলের মালা, কণ্ঠহার ও মণিমালা সর্বদা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে। এগুলি ছাড়াও রয়েছে কৌস্তুভ-মণির সৌন্দর্য আর ভগবানের শ্যাম বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন, যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। এই উজ্জ্বল শ্রীবৎস-চিহ্ন স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যকেও তিরস্কার করছে ।

তাৎপর্য

সিংহের স্কন্ধদেশে কেশরাদি দেখতে সর্বদাই খুব সুন্দর লাগে। তেমনই, ভগবানের স্কন্ধদেশ হচ্ছে সিংহেরই মতো, এবং কৌস্তুভ-মণিসহ কণ্ঠহার ও ফুলের মালা

সিংহের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। ভগবানের বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-রেখা রয়েছে, তা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। তার ফলে ভগবানের বক্ষস্থলের সৌন্দর্য স্বর্ণ-রেখাঙ্কিত কষ্টিপাথরের সৌন্দর্যের থেকেও অধিক সুন্দর। সোনার শুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য যখন কালো কষ্টিপাথরে দাগ দেওয়া হয়, তখন সেই স্বর্ণরেখার দ্বারা অঙ্কিত হওয়ার ফলে, সেই কষ্টিপাথরকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগে, কিন্তু ভগবানের বক্ষস্থলের সৌন্দর্য কষ্টিপাথরের সেই সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে।

শ্লোক ৫০

পূররেচকসংবিগ্নবলিবল্গুদলোদরম্ ।
প্রতিসংক্রাময়দ্বিশ্বং নাভ্যাবর্তগভীরয়া ॥ ৫০ ॥

পূর—শ্বাস গ্রহণ করে; **রেচক**—শ্বাস ত্যাগ করে; **সংবিগ্ন**—বিচলিত; **বলি**—উদরের ত্রিবলি-রেখা; **বল্গু**—সুন্দর; **দল**—অশ্বত্থের পত্রের মতো; **উদরম্**—উদর; **প্রতিসংক্রাময়ৎ**—যেখান থেকে নির্গত হয়ে, পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করেছে; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **নাভ্যা**—নাভি; **আবর্ত**—আবর্তিত হয়ে; **গভীরয়া**—গভীরতার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবানের উদর ত্রিবলি-রেখায় শোভিত। তা অশ্বত্থ পত্রের মতো গোল, এবং তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, সেই উদর অত্যন্ত সুন্দরভাবে কম্পিত হয়। ভগবানের নাভিদেশ এত গভীর যে, মনে হয় যেন সেখান থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে পুনরায় সেখানেই প্রবেশ করতে চায়।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত কমল-নালে। সেই কমল-নালের উপর উপবিষ্ট হয়ে, ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের নাভি এত গভীর এবং কুণ্ডলাকার যে, মনে হয় যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে, পুনরায় আবার সেই নাভিতেই ফিরে যেতে চায়। ভগবানের নাভি ও তাঁর উদরের ত্রিবলি-রেখা তাঁর সৌন্দর্যকে সর্বদা বর্ধিত করে। ভগবানের দেহের সৌন্দর্যের এই বিস্তৃত বিবরণ বিশেষভাবে সূচিত করে যে, ভগবান হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ। নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের দেহের সৌন্দর্য কখনও বুঝতে পারে না, যার বর্ণনা শিব এখানে তাঁর বন্দনার মাধ্যমে করেছেন। নির্বিশেষবাদীরা যদিও সাধারণত শিবের পূজা করে থাকে, তবুও ভগবানের দেহের সৌন্দর্য বর্ণনা করে

শিব যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন, তা বুঝতে তাঁরা অক্ষম। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৩) ভগবান বিষ্ণুকে *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি সর্বদা ব্রহ্মা ও শিবের দ্বারা পূজিত।

শ্লোক ৫১

শ্যামশ্রোণ্যধিরোচিষ্ণুদুকূলস্বর্ণমেখলম্ ।
সমচার্বঙ্ঘ্রিজঙ্ঘোরুনিম্নজানুসুদর্শনম্ ॥ ৫১ ॥

শ্যাম—শ্যামবর্ণ; **শ্রোণি**—কোমরের নিম্নভাগ; **অধি**—অতিরিক্ত; **রোচিষ্ণু**—মনোহর; **দুকূল**—বস্ত্র; **স্বর্ণ**—স্বর্ণনির্মিত; **মেখলম্**— কোমরবন্ধ; **সম**—সমান; **চারু**—সুন্দর; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্ম; **জঙ্ঘ**—জঙ্ঘা; **উরু**—উরুদ্বয়; **নিম্ন**—অনুন্নত; **জানু**—জানুদ্বয়; **সু-দর্শনম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

ভগবানের কোমরের নিম্নভাগ শ্যামবর্ণ এবং তা পীতবর্ণ বস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত মেখলার দ্বারা সুশোভিত। তাঁর পাদপদ্ম, জঙ্ঘা, উরুদ্বয় ও জানুযুগল পরস্পর সমান এবং অপূর্ব সুন্দর। তাঁর সমগ্র শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২০) যে বারোজন মহাজনের উল্লেখ করা হয়েছে, শিব তাঁদের অন্যতম। সেই মহাজনেরা হচ্ছেন স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি বা শুকদেব গোস্বামী ও যমরাজ। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা সাধারণত শিবের পূজা করে, তাদের কর্তব্য ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এখানে শিব অত্যন্ত কৃপাপূর্বক ভগবানের দেহের সৌন্দর্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এইভাবে বোঝা যায়, নির্বিশেষবাদীরা যে বলে ভগবানের কোন রূপ নেই, তা কোন অবস্থাতেই স্বীকার করা যায় না।

শ্লোক ৫২

পদা শরৎপদ্মপলাশরোচিষা
নখদ্যুভির্নোঽন্তরঘং বিধুন্বতা ।
প্রদর্শয় স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্ ॥ ৫২ ॥

পদা—শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা; **শরৎ**—শরৎ ঋতু; **পদ্ম**—পদ্মফুল; **পলাশ**—দল; **রোচিষা**—অত্যন্ত মনোহর; **নখ**—নখ; **দ্যুভিঃ**—জ্যোতির দ্বারা; **নঃ**—আমাদের; **অন্তঃ-অঘম্**—মল; **বিধুন্বতা**—যা পরিষ্কার করতে পারে; **প্রদর্শয়**—প্রদর্শন করুন; **স্বীয়ম্**—নিজের; **অপাস্ত**—হ্রাস করে; **সাধ্বসম্**—জড় জগতের বিপত্তি; **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **গুরো**—হে পরম গুরুদেব; **মার্গ**—পথ; **গুরুঃ**—শ্রীগুরুদেব; **তমঃ-জুষাম্**—যারা অজ্ঞানতাবশত দুঃখকষ্ট ভোগ করছে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মতো, এবং আপনার সেই পাদপদ্মের নখরাজির দীপ্তি বদ্ধ জীবদের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার সেই রূপ প্রদর্শন করুন, যা ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করে। হে ভগবান! আপনি সকলের পরম গুরু; অতএব অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বদ্ধ জীব আপনার কাছ থেকে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

শিব এইভাবে প্রামাণিকরূপে ভগবানের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা করেছেন। এখন তিনি ভগবানের চরণ-কমল দর্শন করতে চাইছেন। যখন কোন ভক্ত ভগবানের দিব্যরূপ দর্শন করতে চান, তখন তিনি ভগবানের দেহের ধ্যান শুরু করেন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে। *শ্রীমদ্ভাগবতকে* দিব্য বাণীরূপে ভগবানের প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং তার বারোটি স্কন্ধ ভগবানের চিন্ময় রূপের বারোটি অঙ্গ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বলে বর্ণনা করা হয়। তাই শিব নির্দেশ দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ, কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতে চান, তা হলে তাঁকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে পাঠ শুরু করতে হবে।

ভগবানের চরণ-কমলের সৌন্দর্যের উপমা শরৎকালের পদ্মপলাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে শরৎকালে নদী ও সরোবরের ঘোলাটে অথবা কর্দমাক্ত জল স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই সময় যে পদ্ম ফোটে তা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। পদ্মফুলের তুলনা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে করা হয়, এবং সেই পদ্মদলের তুলনা করা হয়, ভগবানের পায়ের নখের সঙ্গে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখ অত্যন্ত উজ্জ্বল, যা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহস্য*—ভগবানের দিব্য রূপের প্রতিটি অঙ্গ

আনন্দ-চিন্ময়-সদুজ্জ্বল । এইভাবে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ নিরন্তর অতি উজ্জ্বল। সূর্যকিরণ যেমন এই জড় জগতের অন্ধকার দূর করে, ভগবানের অঙ্গজ্যোতি তেমনই বদ্ধ জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন। অর্থাৎ, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে চান এবং ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করতে চান, তাঁদের সর্বপ্রথমে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে। কেউ যখন ভগবানের সেই পাদপদ্ম দর্শন করেন, তখন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত সন্দেহ ও ভয় দূর হয়ে যায়।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে হলে, নির্ভয় হতে হয়। *অভয়ং সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৬/১)। জড় বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ* —দেহাত্ম-বুদ্ধির ফলে ভয়ের উদয় হয়। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার ভয় থাকে, কিন্তু সেই জড় ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, তিনি *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হয়ে অথবা আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে, তৎক্ষণাৎ নির্ভয় হন। *ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা* (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪)। নির্ভয় না হয়ে কখনও আনন্দময় হওয়া যায় না। ভগবদ্ভক্তরা সর্বদা নির্ভয় ও আনন্দময়, কারণ তাঁরা নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত। আরও বলা হয়েছে—

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/২০)

ভগবদ্ভক্তি-যোগের অনুশীলনের ফলে, নির্ভয় ও আনন্দময় হওয়া যায়। নির্ভয় ও আনন্দময় না হলে, ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। *ভগবৎ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মুক্ত-সঙ্গস্য জায়তে* । এই শ্লোকটি তাঁদেরকে ইঙ্গিত করে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে এই জড় জগতের ভয় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কেউ যখন এইভাবে মুক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তাই ভগবদ্ভক্তি-যোগ অনুশীলন করার জন্য শিব সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, তা করার ফলে যথাযথভাবে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়।

আরও উল্লেখ করা হয়েছে—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ভগবান হচ্ছেন পরম গুরুদেব, এবং ভগবানের প্রামাণিক প্রতিনিধিও হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। ভগবান তাঁর চরণ-কমলের নখের জ্যোতির দ্বারা তাঁর ভক্তের অন্তর থেকে জ্ঞানের আলোক প্রকাশ করেন, এবং ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব ভক্তকে বাইরে থেকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন। কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করার ফলে এবং নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের উপদেশ গ্রহণ করার ফলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় এবং বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এইভাবে *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি যাঁর অবিচলিত ভক্তি রয়েছে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫৩

এতদ্রূপমনুধ্যেয়মাত্মশুদ্ধিমভীপ্সতাম্ ।
যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫৩ ॥

এতৎ—এই; **রূপম্**—রূপ; **অনুধ্যেয়ম্**—ধ্যান করা অবশ্য কর্তব্য; **আত্ম**—আত্মা; **শুদ্ধিম্**—পবিত্রীকরণ; **অভীপ্সতাম্**—যাঁরা তা আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের; **যৎ**—যা; **ভক্তি-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **অভয়-দঃ**—প্রকৃত অভয় প্রদানকারী; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তিকারক কর্তব্য; **অনুতিষ্ঠতাম্**—সম্পাদন করে।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাঁরা তাঁদের জীবন পবিত্র করতে চান, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা। যাঁরা তাঁদের স্বধর্ম অনুষ্ঠানে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং যাঁরা ভয় থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁদের এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

কথিত হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, লীলা ও পরিকরদের স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; তাই ইন্দ্রিয়গুলির পবিত্রীকরণের জন্য ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া কর্তব্য, এবং তার ফলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করা যায়। এখানে কিন্তু ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাঁরা নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁরা

নিশ্চিতভাবে জড় ইন্দ্রিয়ের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। এই যুগে জনসাধারণের কাছে 'ধ্যান' শব্দটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কিন্তু তারা ধ্যান শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তা জানে না। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, যোগীরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/১৩/১)। সেটিই হচ্ছে যোগীদের প্রকৃত কর্তব্য—নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করা। শিব তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাঁদের এই ধ্যানের পন্থায় বা অষ্টাঙ্গ-যোগের পন্থায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এবং তা কেবল তাঁদের নিরন্তর ভগবৎ-দর্শনেই সাহায্য করবে তাই নয়, অধিকন্তু বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর পার্ষদত্ব লাভ করে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারবেন।

স্ব-ধর্মম্ শব্দটি (*স্বধর্মম্ অনুতিষ্ঠতাম্* বর্ণনা অনুসারে) ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি তাঁর জীবনের কোন প্রকার সুরক্ষা কামনা করেন, তা হলে ভক্তিযোগের দ্বারা সমর্থিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলন সম্পাদন করা কর্তব্য। সাধারণত মানুষ মনে করে যে, কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্পাদন করার ফলেই কেবল নির্ভয় হওয়া যায় অথবা নিশ্চিতরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিযোগ সহকারে সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ভয় হওয়া যায় না। *ভগবদ্‌গীতায়* কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু ভক্তিযোগের স্তরে না আসা পর্যন্ত, অন্য সমস্ত যোগগুলি জীবনের চরম সিদ্ধিলাভে সাহায্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভক্তিযোগই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র উপায়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও* সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়েছে। সেই আলোচনায় রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্পর্কে বলেছেন যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠানও বাহ্য ক্রিয়া (*এহো বাহ্য*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বুঝিয়েছেন যে, কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে মুক্তিলাভের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায় না। অবশেষে রামানন্দ রায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেছেন—*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)। জীবনের অবস্থা নির্বিশেষে কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করেন, যার শুরু হয় ভগবদ্ভক্তের শ্রীমুখ থেকে

ভগবানের চিন্ময় বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে *(শ্রুতি-গতাম্)*, তখন তিনি ধীরে ধীরে অজেয় পরমেশ্বর ভগবানকে জয় করতে পারেন।

ভগবানকে বলা হয় অজিত, কিন্তু যিনি শরণাগত হয়ে স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের বাণী শ্রবণ করেন, তিনি অজিত ভগবানকে জয় করতে পারেন। অর্থাৎ কেউ যদি মুক্তিলাভের ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুষ্ঠান করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাঁকে ভক্তিযোগেও যুক্ত হতে হবে, যার শুরু হয় আত্ম-উপলব্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। এই পন্থা তাঁকে অজিত ভগবানকে জয় করতে সাহায্য করবে, এবং তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করবেন।

শ্লোক ৫৪

ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্ ।
স্বারাজ্যস্যাপ্যভিমত একান্তেনাত্মবিদ্‌গতিঃ ॥ ৫৪ ॥

ভবান্—আপনি; **ভক্তি-মতা**—ভক্তের দ্বারা; **লভ্যঃ**—লভ্য; **দুর্লভঃ**—দুর্লভ; **সর্ব-দেহিনাম্**—অন্য সমস্ত জীবদের; **স্বারাজ্যস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অপি**—ও; **অভিমতঃ**—চরম লক্ষ্য; **একান্তেন**—কৈবল্যের দ্বারা; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববিদের; **গতিঃ**—চরম লক্ষ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রও জীবনের চরম লক্ষ্য ভগবদ্ভক্তি লাভে অভিলাষী। তেমনই, আপনি ব্রহ্মবাদীদেরও চরম লক্ষ্য। কিন্তু, তাদের পক্ষে আপনাকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, অথচ যাঁরা আপনার ভক্ত, তাঁরা আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে—*বেদেষু দুর্লভম্ অদুর্লভম্ আত্ম-ভক্তৌ* । তা ইঙ্গিত করে যে, কেবল বেদান্ত-দর্শন বা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, জীবনের চরম লক্ষ্য বা জীবের পরম গন্তব্যস্থল বৈকুণ্ঠলোক বা গোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, ভগবদ্ভক্তের পক্ষে সেই পরম সিদ্ধি লাভ করা অতি সহজ। *বেদেষু দুর্লভম্ অদুর্লভম্ আত্ম-ভক্তৌ*—এর অর্থ হচ্ছে তাই। এই শ্লোকে শিব সেই কথাই প্রতিপন্ন করেছেন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের দ্বারা ভগবানকে

প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগী, তাঁদের পক্ষে ভগবানকে লাভ করা মোটেই কঠিন নয়। *স্বারাজ্যস্য* শব্দটি স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্রকে বোঝায়। সাধারণত কর্মীরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করতে চায়। যারা মনে করে *অহং ব্রহ্মাস্মি* ('আমি হচ্ছি পরম ব্রহ্ম, আমি পরম সত্যের সঙ্গে এক'), তারাও চরমে বৈকুণ্ঠলোকে বা গোলোক বৃন্দাবনে পূর্ণ মুক্তিলাভের বাসনা করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানা যায়। কেউ যখন এই ভক্তির দ্বারা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন।"

অতএব, কেউ যদি চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভক্তিযোগের অনুশীলনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চেষ্টা করতে হবে। এই প্রকার উপলব্ধি ব্যতীত, কখনও চিৎ-জগতে প্রবেশ করা যায় না। কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারেন অথবা নিজেকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করতে পারেন *(অহং ব্রহ্মাস্মি),* কিন্তু তা চরম তত্ত্বজ্ঞান নয়। ভক্তিযোগের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য; তখনই কেবল জীবনের প্রকৃত পূর্ণতা লাভ হয়।

শ্লোক ৫৫

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া ।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎপাদমূলং বিনা বহিঃ ॥ ৫৫ ॥

তম্—আপনাকে; **দুরারাধ্যম্**—আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **আরাধ্য**—আরাধনা করে; **সতাম্ অপি**—সব চাইতে উন্নত ব্যক্তিও; **দুরাপয়া**—দুর্লভ; **একান্ত**—শুদ্ধ; **ভক্ত্যা**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **কঃ**—সেই ব্যক্তিটি কে; **বাঞ্ছেৎ**—বাসনা করা উচিত; **পাদ-মূলম্**—চরণপদ্ম; **বিনা**—ব্যতীত; **বহিঃ**—বহির্মুখী ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

হে ভগবান! ভগবদ্ভক্তি মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু এই ভক্তির দ্বারাই কেবল আপনার প্রসন্নতা-বিধান করা যায়। কেউ যদি জীবনের সিদ্ধিলাভের বিষয়ে প্রকৃতই নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধির অন্য পন্থা তিনি কেন গ্রহণ করবেন?

তাৎপর্য

সতাম্ শব্দটি পরমার্থবাদীকে ইঙ্গিত করে। তিন প্রকার পরমার্থবাদী রয়েছেন—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। তাঁদের মধ্যে ভক্তই হচ্ছেন ভগবানকে লাভ করার সব চাইতে উপযুক্ত। এখানে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ভক্তি-বহির্মুখ ব্যক্তিরাই কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অন্বেষণ করে না। মূর্খ মানুষেরাই কেবল মনে করে যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ইত্যাদি যে-কোন উপায়েই ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবানের কৃপা লাভ করা অসম্ভব। *দুরারাধ্য* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৫৬

যত্র নির্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে ।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্যশৌর্যবিস্ফূর্জিতভ্রুবা ॥ ৫৬ ॥

যত্র—যেখানে; **নির্বিষ্টম্ অরণম্**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত আত্মা; **কৃত-অন্তঃ**—দুর্দম্য কাল; **ন অভিমন্যতে**—আক্রমণ করে না; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **বিধ্বংসয়ন্**—সংহার দ্বারা; **বীর্য**—পরাক্রম; **শৌর্য**—প্রভাব; **বিস্ফূর্জিত**—কেবলমাত্র বিস্তারের দ্বারা; **ভ্রুবা**—ভ্রূর।

অনুবাদ

অজেয় কাল কেবলমাত্র তাঁর ভ্রূকুটি বিলাসের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে। কিন্তু যাঁরা সম্পূর্ণরূপে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত ভক্ত, তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর কাল আসতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/৩৪) বলা হয়েছে যে, মৃত্যুরূপে ভগবান সকলের সমস্ত সম্পদ হরণ করে নেন। *মৃত্যুঃ সর্ব-হরশ্চাহম্*—"আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" বদ্ধ জীবেরা যা কিছু সৃষ্টি করে, মৃত্যুরূপে ভগবান তা সব ছিনিয়ে নেন। এই জড় জগতে কালের প্রভাবে সব কিছুই বিনাশশীল। কিন্তু কাল তার সমস্ত শক্তি দিয়েও ভক্তের কার্যকলাপে বাধা দিতে পারে না, কারণ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত। সেই কারণেই কেবল ভক্ত দুর্জয় কালের প্রভাব থেকে

মুক্ত। কর্মী ও জ্ঞানীদের সমস্ত কার্যকলাপ, যার সঙ্গে ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই, তা কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। কর্মীদের জড়-জাগতিক সাফল্য একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে; তেমনই, জ্ঞানীদের নির্বিশেষ উপলব্ধিও কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)

কর্মীদের কি কথা, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জ্ঞানীরা কঠোর তপস্যা করে, কিন্তু তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করতে পারে না। তাই তারা পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সম্পূর্ণরূপে অনন্য ভক্তিতে স্থিত না হওয়া পর্যন্ত, স্বর্গলোকে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও, মুক্তির কোন নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু ভক্তির প্রভাবে ভক্ত যা লাভ করেন, তা কখনও কালের প্রভাবে নষ্ট হয় না। এমন কি ভক্ত যদি তাঁর ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নাও করতে পারেন, তবুও যেখানে শেষ করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী জন্মে তিনি সেখান থেকে আবার ভগবদ্ভক্তি শুরু করবেন। এই প্রকার সুযোগ কর্মী ও জ্ঞানীদের দেওয়া হয় না, কারণ তাদের সাধনা বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ভক্তের প্রাপ্তি কখনও বিনষ্ট হয় না, কারণ তা পূর্ণ হোক অথবা অপূর্ণ হোক, তা নিরন্তর চলতে থাকে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।* কেউ যদি তাঁর ভক্তিযোগের সাধনা পূর্ণ করতে নাও পারেন, তবুও তিনি পরবর্তী জীবনে শুদ্ধ ভক্ত পরিবারে অথবা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় তাঁর অসম্পূর্ণ সাধনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এই প্রকার পরিবারে মানুষেরা ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতিসাধন করার অত্যন্ত সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হন।

যমরাজ যখন যমদূতদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন ভক্তদের কাছে না যেতে। তিনি বলেছিলেন, "ভক্তদের দূর থেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো, এবং তাঁদের কাছে যেও না।" এইভাবে ভগবদ্ভক্ত যমরাজের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নন। যমরাজ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তিনি সমস্ত জীবের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করেন। তবুও ভক্তদের ক্ষেত্রে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। মূর্তিমান মহাকাল তাঁর চোখের পলকে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু ভক্তদের তিনি কিছু করতে পারেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত এই জীবনে যে-ভক্তি সম্পাদন করেছেন, তা কালের প্রভাবে নষ্ট হয় না। এই প্রকার আধ্যাত্মিক সম্পদ কালের প্রভাবের অতীত হওয়ার ফলে, অপরিবর্তিতই থাকে।

শ্লোক ৫৭

ক্ষণার্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৭ ॥

ক্ষণ-অর্ধেন—ক্ষণার্ধের দ্বারা; **অপি**—ও; **তুলয়ে**—তুলনা; **ন**—কখনই না; **স্বর্গম্**—স্বর্গলোক; **ন**—না; **অপুনঃ-ভবম্**—পরমেশ্বরে লীন হয়ে যাওয়া; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঙ্গি**—সঙ্গী; **সঙ্গস্য**—সঙ্গলাভের সুযোগ গ্রহণ করে; **মর্ত্যানাম্**—বদ্ধ জীবদের; **কিম্ উত**—কি রয়েছে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ক্ষণার্ধের জন্যও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের সুযোগ পান, তা হলে আর তাঁর কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তা হলে যে সমস্ত দেবতারা জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁদের কাছ থেকে বর লাভ করার প্রতি তাঁর কি আর আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

তাৎপর্য

এখানে কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদের মধ্যে ভক্তদের সর্বোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গেয়েছেন—*কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে* (*চৈতন্য-চরিতামৃত*)। *কৈবল্য* মানে হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে যাওয়া, আর *ত্রিদশ-পূর্* হচ্ছে স্বর্গলোক, যেখানে দেবতারা থাকেন। এইভাবে ভক্তদের কাছে *কৈবল্য-সুখ* বা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়া নরকতুল্য, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে তাঁর অস্তিত্ব হারানোকে ভক্ত আত্মহত্যার সমতুল্য বলে মনে করেন। ভগবানের সেবা করার জন্য ভক্ত সর্বদাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চান। আর স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়াকে তিনি আকাশ-কুসুম বলে মনে করেন। ভক্তের কাছে ক্ষণস্থায়ী জড়-জাগতিক সুখের কোন মূল্য নেই। ভক্ত এত উন্নত স্তরে রয়েছেন যে, কর্ম অথবা জ্ঞানের প্রতি তাঁর কোন রুচি নেই। চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তের কাছে কর্ম ও জ্ঞানের ফল এতই তুচ্ছ যে, তাদের প্রতি তাঁর স্বল্পমাত্রও আসক্তি থাকে না। ভক্তকে সমস্ত সুখ প্রদানের জন্য ভক্তিযোগই যথেষ্ট। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—*যয়াত্মা সুপ্রসীদতি* । কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হওয়া যায়, এবং সেটিই হচ্ছে ভক্তসঙ্গের ফল। শুদ্ধ ভক্তের আশীর্বাদ ব্যতীত কেউই পূর্ণরূপে প্রসন্ন হতে পারেন না, এবং পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না।

শ্লোক ৫৮

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্ ।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎসঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥ ৫৮ ॥

অথ—অতএব; **অনঘ-অঙ্ঘ্রেঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট করে; **তব**—আপনার; **কীর্তি**—মহিমা; **তীর্থয়োঃ**—পবিত্র গঙ্গাজল; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—এবং বাইরে; **স্নান**—স্নান; **বিধূত**—ধৌত; **পাপ্মনাম্**—মনের কলুষিত অবস্থা; **ভূতেষু**—সাধারণ জীবদের; **অনুক্রোশ**—বর অথবা কৃপা; **সু-সত্ত্ব**—সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণে; **শীলিনাম্**—এই প্রকার গুণসম্পন্ন যাঁরা তাঁদের; **স্যাৎ**—হোক; **সঙ্গমঃ**—সঙ্গ; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **এষঃ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত মঙ্গলের উৎস এবং সমস্ত পাপের কলুষ বিনাশকারী। আমি তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন আমাকে আপনার ভক্তদের সঙ্গলাভের আশীর্বাদ করেন, যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করার ফলে, সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছেন এবং যাঁরা বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আমি মনে করি যে, আপনার এই প্রকার ভক্তদের সঙ্গ করার সৌভাগ্যই হবে আমার প্রতি আপনার প্রকৃত আশীর্বাদ।

তাৎপর্য

গঙ্গাজল সমস্ত পাপ দূর করে। অর্থাৎ, কেউ যখন গঙ্গায় স্নান করেন, তিনি তখন তাঁর জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন। গঙ্গাজলের এই মহিমার কারণ হচ্ছে, গঙ্গা ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তেমনই যাঁরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে যুক্ত এবং যাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তনে মগ্ন, তাঁরা সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা সাধারণ বদ্ধ জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে সক্ষম। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গেয়েছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা এতই শক্তিশালী যে, তাঁদের প্রত্যেকে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে সক্ষম। অর্থাৎ, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের মহিমা প্রচার করে, সমস্ত বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করে শুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে উন্নীত করা। এখানে

সু-সত্ত্ব শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ সত্ত্ব', যা জড়-জাগতিক সত্ত্বগুণের অতীত এক চিন্ময় স্তর। শিব তাঁর আদর্শ প্রার্থনার দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও তাঁর বৈষ্ণব ভক্তদের শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ৫৯

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াং চ বিশুদ্ধমাবিশৎ ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্ ॥ ৫৯ ॥

ন—কখনই না; **যস্য**—যাঁর; **চিত্তম্**—হৃদয়; **বহিঃ**—বাহ্যিক; **অর্থ**—রুচি; **বিভ্রমম্**—মোহিত; **তমঃ**—অন্ধকার; **গুহায়াম্**—গুহায়; **চ**—ও; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছেন; **যৎ**—যা; **ভক্তি-যোগ**—ভগবদ্ভক্তি; **অনুগৃহীতম্**—কৃপা প্রাপ্ত; **অঞ্জসা**—প্রসন্নতাপূর্বক; **মুনিঃ**—চিন্তাশীল; **বিচষ্টে**—দর্শন করেন; **ননু**—কিন্তু; তত্র—সেখানে; **তে**—আপনার; **গতিম্**—কার্যকলাপ।

অনুবাদ

যে ভক্তের হৃদয় ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছে এবং যিনি ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করেছেন, তিনি কখনও অন্ধকূপ-সদৃশ বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হন না। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে, ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনার নাম, যশ, রূপ, কার্যকলাপ ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২৫) বলা হয়েছে—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

কেবল শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ভগবানের দিব্য নাম, যশ, গুণ ও কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বার বার বলেছেন—

'সাধুসঙ্গ', সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ২২/৫৪)

কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ কৃষ্ণভক্তির পথে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি-সাধন করতে পারে। সাধুসঙ্গ বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ মানে হচ্ছে, সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা যুক্ত থাকা। বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন মানুষকে পবিত্র করে, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কীর্তন করার উপদেশ দিয়েছেন। *চেতো-দর্পণ-মার্জনম্*—শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে চিত্তরূপ দর্পণ পরিষ্কার হয়ে যায়, এবং তখন ভক্তের আর বহির্মুখী কার্যকলাপের প্রতি কোন রুচি থাকে না। কেউ যখন ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবিত থাকে, তখন তার হৃদয় কলুষিত থাকে। হৃদয় নির্মল না হলে বোঝা যায় না, কিভাবে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। *ইদং হি বিশ্বং ভগবান্ ইবেতরঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/২০)। যাঁর হৃদয় পবিত্র হয়েছে তিনি দেখতে পান যে, সমগ্র জগৎ হচ্ছে ভগবানেরই প্রকাশ, কিন্তু যাঁর হৃদয় কলুষিত, তিনি অন্যভাবে দর্শন করেন। তাই সৎসঙ্গ বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়।

যাঁর হৃদয় পবিত্র, তিনি কখনও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না, সেই শক্তি সর্বদা বদ্ধ জীবদের জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র-হৃদয় ভগবদ্ভক্ত যখন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তখন তিনি কখনও বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মোট নয়টি পন্থা রয়েছে, এবং সেই পন্থায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনকারী শুদ্ধ ভক্ত কখনও বিচলিত হন না। দশটি নামাপরাধ ও চৌষট্টিটি সেবা-অপরাধ বর্জন করে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করা উচিত। ভক্ত যখন নিষ্ঠা সহকারে এই সমস্ত বিধিগুলি অনুশীলন করেন, তখন ভক্তিদেবী তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তখন আর তিনি বাহ্যিক কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত হন না। ভগবদ্ভক্তকে *মুনিও* বলা হয়। *মুনি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'চিন্তাশীল'। এক অভক্ত যেমন জল্পনা-কল্পনা-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত ঠিক তেমনই চিন্তাশীল। অভক্তদের জল্পনা-কল্পনা অশুদ্ধ, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের চিন্তা পবিত্র। কপিলদেব ও শুকদেব গোস্বামীকেও *মুনি* বলা হয়, এবং ব্যাসদেবকে মহামুনি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভক্তকে *মুনি* বা চিন্তাশীল বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। অতএব সিদ্ধান্তটি হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এবং নামাপরাধ

ও সেবাপরাধ বর্জন করার ফলে হৃদয় যখন নির্মল হয়, তখন ভগবানের দিব্য নাম, রূপ ও কার্যকলাপ ভগবানই তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৬০

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ ।
তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ৬০ ॥

যত্র—যেখানে; **ইদম্**—এই; **ব্যজ্যতে**—প্রকাশিত; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **বিশ্বস্মিন্**—জগতে; **অবভাতি**—প্রকাশিত হয়; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **ত্বম্**—আপনি; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **পরম্**—দিব্য; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **আকাশম্**—আকাশ; **ইব**—সদৃশ; **বিস্তৃতম্**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

হে ভগবান! নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূর্য কিরণের মতো অথবা আকাশের মতো সর্বব্যাপ্ত। এবং সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, তা আপনিই।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সব কিছুই ব্রহ্ম এবং তার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। সমগ্র জগৎ ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থিত। নির্বিশেষবাদীরা কিন্তু বুঝতে পারে না, কিভাবে এই বিশাল বিশ্ব একজন ব্যক্তিতে অবস্থিত। এইভাবে নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না; তাই তারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে, পরম সত্য যে একজন পুরুষ তা অস্বীকার করে। এই ভ্রান্ত ধারণা শিব স্বয়ং দূর করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত, তা হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান ব্রহ্ম রূপে সূর্যকিরণের মতো সর্বব্যাপ্ত। এই দৃষ্টান্তটি হৃদয়ঙ্গম করা খুবই সহজ। সমস্ত ভুবন সূর্যকিরণে অবস্থিত, তবুও সূর্যকিরণ ও সূর্যকিরণের উৎস সেই সমস্ত ভুবনগুলি থেকে পৃথক। তেমনই আকাশ অথবা বায়ু সর্বব্যাপ্ত; বায়ু ঘটের ভিতরেও রয়েছে, আবার তা পবিত্র ও অপবিত্র উভয় স্থানেই রয়েছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আকাশ কখনও অপবিত্র হয় না। সূর্যকিরণও অপবিত্র ও পবিত্র উভয় স্থানকেই স্পর্শ করে, এবং উভয়েই যদিও সূর্যের দ্বারাই উৎপন্ন, তবুও সূর্য সমস্ত নোংরা বস্তু থেকে পৃথক থাকে। তেমনই, ভগবান সর্বব্যাপ্ত। পবিত্র ও অপবিত্র

বস্তু রয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পবিত্র বস্তুগুলি হচ্ছে ভগবানের সম্মুখভাগ, এবং অপবিত্র বস্তুগুলি ভগবানের পশ্চাৎ-ভাগ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"আমার অব্যক্ত রূপের দ্বারা আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত। সব কিছুই আমাতে স্থিত, তবুও আমি সেগুলিতে অবস্থিত নই।"

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করে যে, ভগবান তাঁর ব্রহ্মস্বরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত। সব কিছুই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, তবুও তিনি সেগুলিতে অবস্থিত নন। তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভক্তিযোগ ব্যতীত, ভগবানের সেবা ব্যতীত, নির্বিশেষবাদীরাও ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে—*অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা* । অর্থাৎ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা পরব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* পরমতত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে উপলব্ধি হয় তিনটি স্বরূপে—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান হচ্ছেন অন্তিম সত্য, এবং এই শ্লোকেও শিব প্রতিপন্ন করেছেন যে, চরমে পরম সত্য হচ্ছেন একজন সবিশেষ পুরুষ। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন—*তৎ ত্বং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্।* এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—একজন সফল ব্যবসায়ীর বহু কলকারখানা ও অফিস থাকতে পারে, এবং সেগুলি সবই তাঁর আদেশের উপর নির্ভর করে থাকে। কেউ যদি বলে যে, সমস্ত ব্যবসাটি সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে রয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সমস্ত অফিস ও ফ্যাক্টরীগুলি তাঁর মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন। পক্ষান্তরে বুঝতে হয় যে, তাঁরই মস্তিষ্কের দ্বারা অথবা তাঁর শক্তির বিস্তারের দ্বারা সেই ব্যবসাটি নির্বিঘ্নে চলছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের মস্তিষ্ক ও শক্তির দ্বারা সমগ্র জড় জগৎ এবং চিন্ময় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে অদ্বৈত দর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা স্বীকার করে যে, সমস্ত শক্তির পরম উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথাটি এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপ যে কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাও বর্ণনা করা হয়েছে—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥

"হে কৌন্তেয় (অর্জুন), আমি জলের স্বাদ, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক, বৈদিক মন্ত্রের ওঁকার; আমি আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৮)

এইভাবে সব কিছুর যোগশক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৬১

যো মায়য়েদং পুরুরূপয়াসৃজদ্
বিভর্তি ভূয়ঃ ক্ষপয়ত্যবিক্রিয়ঃ ।
যদ্ভেদবুদ্ধিঃ সদিবাত্মদুঃস্থয়া
ত্বমাত্মতন্ত্রং ভগবন্ প্রতীমহি ॥ ৬১ ॥

যঃ—যিনি; **মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **পুরু**—বহু; **রূপয়া**—রূপের দ্বারা; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছেন; **বিভর্তি**—পালন করেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **ক্ষপয়তি**—সংহার করেন; **অবিক্রিয়ঃ**—পরিবর্তিত না হয়ে; **যৎ**—যা; **ভেদ-বুদ্ধিঃ**—ভেদভাব; **সৎ**—নিত্য; **ইব**—সদৃশ; **আত্ম-দুঃস্থয়া**—নিজেকে কষ্ট দিয়ে; **ত্বম্**—আপনাকে; **আত্ম-তন্ত্রম্**—সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **প্রতীমহি**—আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বহু প্রকার শক্তি রয়েছে, এবং সেই সমস্ত শক্তিগুলি নানারূপে প্রকাশিত। সেই শক্তির দ্বারা আপনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং এমনভাবে তা আপনি পালন করছেন যে, মনে হয় তা যেন চিরস্থায়ী, কিন্তু তবুও চরমে আপনি তা ধ্বংস করেন। যদিও আপনি এই প্রকার পরিবর্তনের দ্বারা কখনও একটুও বিচলিত হন না, তবুও জীবেরা তার ফলে বিচলিত হয়, এবং তাই তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎ আপনার থেকে ভিন্ন। হে ভগবান! আপনি সর্বদা স্বতন্ত্র, এবং তা আমি স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ শক্তি রয়েছে, যা তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—বহিরঙ্গা শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। বিভিন্ন প্রকার জগৎও রয়েছে, যথা—চিৎ-জগৎ ও জড় জগৎ, আর বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। তাদের মধ্যে কোন জীব বদ্ধ এবং অন্যেরা নিত্যমুক্ত। যাঁরা

জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে কখনও আসে না, তাঁদের বলা হয় নিত্যমুক্ত। কিন্তু, কোন কোন জীব এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, এবং তার ফলে তারা নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে। এই জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকার ফলে, তাদের অস্তিত্ব সর্বদাই দুঃখদায়ক। সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতিকে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলে মনে করে। সেই কথা বিশ্লেষণ করে এক বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

জীব যখন পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে, তাঁকে অনুকরণ করে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করতে চায়, তখন সে নিজেকে ভোক্তা বলে অভিমান করে এবং পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই পরাশক্তি জীবাত্মার পক্ষে এই জড় জগৎ অত্যন্ত দুঃখময়, কিন্তু এই জড়া প্রকৃতি ভগবানের কাছে দুঃখদায়ক নয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কাছে জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি উভয়েই সমান। এই শ্লোকে শিব বিশ্লেষণ করেছেন যে, জড়া প্রকৃতি ভগবানের কাছে মোটেই দুঃখদায়ক নয়। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই স্বতন্ত্র, কিন্তু যেহেতু জীব স্বতন্ত্র নয়, তাই স্বতন্ত্রভাবে সুখী হওয়ার ভ্রান্ত ধারণাবশত তার কাছে এই জড় জগৎ দুঃখময়। তার ফলে জড়া প্রকৃতি ভেদভাব সৃষ্টি করে।

যেহেতু মায়াবাদী দার্শনিকেরা তা বুঝতে পারে না, তাই তারা শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু, বৈষ্ণবেরা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তাই তাঁরা এই জড় জগতেও কোন রকম ক্লেশ অনুভব করেন না। তার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা জানেন কিভাবে এই জড়া শক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে হয়। একটি রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকদের চোখে ফৌজদারি বিভাগ ও দেওয়ানি বিভাগ পৃথক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই দুটি বিভাগই এক এবং অভিন্ন। ফৌজদারি বিভাগ অপরাধীদের জন্য কষ্টদায়ক, কিন্তু একজন সৎ নাগরিকের কাছে তা মোটেই কষ্টদায়ক নয়। তেমনই, বদ্ধ জীবদের কাছে জড়া প্রকৃতি কষ্টদায়ক, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত মুক্ত জীবদের কাছে তা নয়। পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর মাধ্যমে ভগবান সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। কেবল নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ভগবান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত করে বিষ্ণুরূপে এই জড় জগতের সৃষ্টি ও পালনকার্য সম্পাদন করেন। তারপর সঙ্কর্ষণরূপে তিনি সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করেন। এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করা সত্ত্বেও ভগবান তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের বিবিধ

কার্যকলাপ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হতে পারে, কিন্তু ভগবান যেহেতু পরম মহান, তাই তিনি কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। শিব ও ভগবানের অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তরা ভেদবুদ্ধির দ্বারা অন্ধ না হয়ে, তা স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারেন। ভক্তের কাছে ভগবান হচ্ছেন পরম আত্মা। যেহেতু তিনি পরম শক্তিমান, তাই তাঁর বিভিন্ন শক্তিও চিন্ময়। ভক্তের কাছে কোন কিছুই জড় নয়, কারণ জড় অস্তিত্ব মানে হচ্ছে ভগবৎ-বিস্মৃতি।

শ্লোক ৬২

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে ।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥ ৬২ ॥

ক্রিয়া—কার্যকলাপ; **কলাপৈঃ**—পন্থার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যোগিনঃ**—যোগীগণ; **শ্রদ্ধা-অন্বিতাঃ**—শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে; **সাধু**—যথাযথভাবে; **যজন্তি**—আরাধনা করেন; **সিদ্ধয়ে**—সিদ্ধির জন্য; **ভূত**—জড়া শক্তি; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্তঃ-করণ**—হৃদয়; **উপলক্ষিতম্**—লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত; **বেদে**—বেদে; **চ**—ও; **তন্ত্রে**—বৈদিক অনুসিদ্ধান্তে; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কোবিদাঃ**—সুপণ্ডিত।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার বিশ্বরূপ পঞ্চ তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আপনার অংশ সর্বান্তর্যামী পরমাত্মার দ্বারা রচিত। ভক্ত ব্যতীত অন্য যোগীরা, যথা কর্মযোগী ও জ্ঞানযোগীরা তাদের স্বীয় স্থিতিতে অবস্থিত থেকে, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা আপনার আরাধনা করে। বেদে, তন্ত্রে ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবল আপনিই আরাধ্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিব ভগবানের সেই রূপ দর্শন করতে চান, যেই রূপে ভক্তরা তাঁকে দর্শন করতে সর্বদা আগ্রহী। এই জড় জগতে

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারূপে ভগবানের অন্য অনেক রূপও রয়েছে, এবং বিষয়াসক্ত মানুষেরাই কেবল সেই সমস্ত রূপের পূজা করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী, তাদের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

ভগবদ্ভক্ত, মোক্ষকামী, জ্ঞানী ও সর্বকামী কর্মী সকলেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করতে চান। এমন কি কেউ যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যা এখানে *ক্রিয়া-কলাপৈঃ* রূপে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন বিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর। বৈদিক ও তান্ত্রিক যজ্ঞে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হলেও, যজ্ঞের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণু। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

"হে কৌন্তেয়! মানুষ যজ্ঞে যখন অন্য দেবতাদের কোন কিছু নিবেদন করে, প্রকৃতপক্ষে তা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা হয়। তারা যথাযথভাবে না জেনে, অবিধিপূর্বক দেবতাদের পূজা করে।"

অতএব বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকেরাও পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু তাঁরা তা করেন অবিধিপূর্বক। বিধির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীরা—প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই—যদি বেদ ও তন্ত্রের জ্ঞানে বাস্তবিকই পণ্ডিত হন, তা হলে তিনি শ্রীবিষ্ণুরই আরাধনা করেন। এখানে *কোবিদাঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ভগবদ্ভক্তদের ইঙ্গিত করে। ভগবানের ভক্তরাই কেবল পূর্ণরূপে জানেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত। জড় জগতে তিনি পাঁচটি জড় উপাদান, এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা প্রকাশিত। আরও একটি শক্তির দ্বারা তিনি

জড় জগতে প্রকাশিত হন, তা হচ্ছে জীবাত্মা। চিৎ-জগৎ ও জড় জগতে সমস্ত প্রকাশই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির অভিব্যক্তি। চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভগবান এক এবং তিনি সব কিছুতেই নিজেকে বিস্তার করেছেন। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,* এই বৈদিক বাণীর মাধ্যমে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি তা জানেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় একাগ্রীভূত করেন।

শ্লোক ৬৩

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তি-
স্তয়া রজঃসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে ।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ
সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥ ৬৩ ॥

ত্বম্—আপনি; **একঃ**—এক; **আদ্যঃ**—আদি; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **সুপ্ত**—সুপ্ত; **শক্তি**—শক্তি; **তয়া**—যার দ্বারা; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **বিভিদ্যতে**—পৃথক হয়ে যায়; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অহম্**—অহঙ্কার; **খম্**—আকাশ; **মরুৎ**—বায়ু; **অগ্নি**—অগ্নি; **বাঃ**—জল; **ধরাঃ**—পৃথিবী; **সুর-ঋষয়ঃ**—দেবতা ও ঋষিগণ; **ভূত-গণাঃ**—জীব; **ইদম্**—এই সমস্ত; **যতঃ**—যার থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি সর্ব-কারণের পরম কারণ একমাত্র পরম পুরুষ। এই জড় জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, আপনার মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যখন আপনার মায়াশক্তি ক্ষোভিত হয়, তখন সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি গুণ সক্রিয় হয়, এবং তার ফলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, আগুন, জল, মাটি, বিভিন্ন দেবতা ও ঋষিগণ প্রকট হন। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

যদি সমগ্র সৃষ্টি এক হয়, অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান বা বিষ্ণু ব্যতীত আর কিছু না হয়, তা হলে কেন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা এইভাবে জড় সৃষ্টির উপাদানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন, যা এই শ্লোকে করা হয়েছে? পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা কেন জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে শিব বলেছেন যে, আত্মা ও জড় পদার্থ বিভিন্ন দার্শনিকেরা সৃষ্টি করেননি, তা সৃষ্টি

করেছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। সেই সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*ত্বম্ এক আদ্যঃ পুরুষঃ।* চেতন ও জড়ের পার্থক্য যদিও ভগবান সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে-সমস্ত জীব নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের কাছে সেই রকম কোন ভেদ নেই। যারা ভগবানের অনুকরণ করে ভোক্তা হতে চায়, তাদের কাছে কেবল জড় জগৎই রয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগৎ হচ্ছে সব কিছুর স্রষ্টা আদি পুরুষ ভগবানকে ভুলে যাওয়ার পরিণাম। যে-সমস্ত জীবেরা ভগবানকে অনুকরণ করে তাঁর মতো ভোগ করতে চায়, তাদের সেই বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভগবান তাঁর সুপ্ত শক্তির দ্বারা জড় ও চেতনের এই পার্থক্য সৃষ্টি করেন। যেমন কখনও কখনও শিশুরা তাদের মায়ের অনুকরণ করে রান্নাঘরে রান্না করতে চায়, এবং মা তখন তাদের কিছু খেলনা দেন, যা দিয়ে শিশুরা তাঁর রান্নার অনুকরণ করতে পারে। তেমনই, কোন জীব যখন ভগবানের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে চায়, তখন ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই এই জড় জগৎ ভগবানের মায়াশক্তির সৃষ্টি। ভগবানের ঈক্ষণের দ্বারা মায়াশক্তি সক্রিয় হয়। তখন জড়া প্রকৃতির গুণগুলি সক্রিয় হয়, এবং মহত্তত্ত্বরূপে সর্বপ্রথমে জড়া শক্তির প্রকাশ হয়। তারপর ক্রমশ অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির প্রকাশ হয়। সৃষ্টির পর, জীবদের প্রকৃতির গর্ভে আধান করা হয়, এবং তাঁরা ক্রমশ ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষিরূপে, তারপর বিভিন্ন দেবতারূপে উদ্ভূত হন। ক্রমে ক্রমে দেবতাদের থেকে মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী ও অন্য সব কিছুর প্রকাশ হয়। সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যে-কথা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে—*ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ* । সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

যারা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত, তারা বুঝতে পারে না যে, সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই সত্য প্রকাশ করে বেদান্ত-সূত্রে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* (*বেদান্ত-সূত্র* ১/১/২)। শ্রীকৃষ্ণও *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন করেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি সমস্ত চেতন ও জড় জগতের উৎস। সব কিছুই আমার থেকে উদ্ভূত হয়। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আমার ভজনা করে আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন যে, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*, তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি ব্রহ্মা, শিব, পুরুষাবতার, জড় জগৎ এবং এই জড় জগতের সমস্ত জীবদের উৎস। প্রকৃতপক্ষে প্রভব ('সৃষ্টি') শব্দটি কেবল এই জড় জগৎকে ইঙ্গিত করে, কারণ চিৎ-জগৎ নিত্য হওয়ার ফলে, তার সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। *শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে* ভগবান বলেছেন, *অহম্ এবাসম্ এবাগ্রে*— "আমি সৃষ্টির পূর্বে ছিলাম।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৯/৩৩) *বেদেও* বলা হয়েছে, *একো নারায়ণ আসীৎ* —"সৃষ্টির পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন।" সেই কথা শঙ্করাচার্যও প্রতিপন্ন করেছেন। *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"নারায়ণ সৃষ্টির অতীত"। (*গীতাভাষ্য*) যেহেতু নারায়ণের সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়, তাই নারায়ণ যখন বলেন, "সৃষ্টি হোক," তখন সেই সৃষ্টি সর্বতোভাবে চিন্ময়। জড়ের অস্তিত্ব কেবল তাদেরই জন্য, যারা ভুলে গেছে যে, নারায়ণ হচ্ছেন সর্ব-কারণের আদি কারণ।

শ্লোক ৬৪

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্ট-
শ্চতুর্বিধং পুরমাত্মাংশকেন ।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত-
র্ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্মধু সারঘং যঃ ॥ ৬৪ ॥

সৃষ্টম্—সৃষ্টিতে; **স্ব-শক্ত্যা**—আপনার নিজের শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই জড় জগৎ; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **চতুঃ-বিধম্**—চার প্রকার; **পুরম্**—দেহ; **আত্ম-অংশকেন**—আপনার নিজের বিভিন্ন অংশের দ্বারা; **অথো**—অতএব; **বিদুঃ**—জানেন; **তম্**—তাকে; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **সন্তম্**—অবস্থিত হয়ে; **অন্তঃ**—অন্তরে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **হৃষীকৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **মধু**—মাধুর্য; **সার-ঘম্**—মধু; **যঃ**—যিনি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করার পর, আপনি চারটি রূপে এই সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। সমস্ত জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হয়ে আপনি তাদের জানেন, এবং কিভাবে তারা তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছে তাও জানেন। এই জড় জগতে তথাকথিত সুখভোগ ঠিক মৌমাছির মৌচাকে সঞ্চিত মধু আস্বাদন করার মতো।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। যেহেতু জড় পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করতে পারে না, তাই ভগবান স্বয়ং এই জড় সৃষ্টিতে তাঁর অংশ প্রকাশরূপে (পরমাত্মা) প্রবেশ করেন, এবং তিনি তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবরূপেও প্রবেশ করেন। অর্থাৎ, এই জড় সৃষ্টিকে সক্রিয় করার জন্য জীব ও ভগবান উভয়েই এই জড় জগতে প্রবেশ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৫) বলা হয়েছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার একটি পরা প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত জীব সেই পরা প্রকৃতিসম্ভূত এবং তারাই এই জগৎকে ধারণ করে রয়েছে।"

এই জড় জগৎ যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় হতে পারে না, তাই জীবেরা চার প্রকার শরীরে এই জড় জগতে প্রবেশ করে। এই শ্লোকে *চতুর্বিধম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই জড় জগতে চার প্রকার জীব রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জীবেরা যেভাবেই এই জড় জগতে আসুক না কেন, তারা সকলেই ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা যে মনে করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবদের আত্মা নেই, তা এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির সমস্ত জীব, তা জরায়ুজ হোক, অণ্ডজ হোক, স্বেদজ হোক বা উদ্ভিজ্জই হোক, সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাই তারা সকলেই স্বতন্ত্র চিৎস্ফুলিঙ্গ এবং আত্মা। ভগবানও মানুষ, পশু, বৃক্ষ, কীট ও পতঙ্গ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যেহেতু সমস্ত জীবেরা এই জড় জগতে আসে তাদের ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, তাই ভগবান জীবদের বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে পরিচালিত করেন। এইভাবে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান সকলের বাসনা সম্বন্ধে অবগত। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান ও বিস্মৃতি আসে।"

সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে ভগবান তাদের স্মৃতি দান করেন, যার ফলে জীবেরা বিশেষ কোন বস্তু উপভোগ করতে পারে। এইভাবে জীবেরা তাদের উপভোগের মধুচক্র সৃষ্টি করে এবং তারপর তা উপভোগ করে। এখানে মৌমাছিদের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ মৌমাছিরা যখন মৌচাকের মধু উপভোগ করার চেষ্টা করে, তখন তাদের অন্যান্য মৌমাছিদের দংশন সহ্য করতে হয়। মৌমাছিরা যেহেতু মধু উপভোগ করার সময় পরস্পরকে দংশন করে, তাই তারা মধুর মিষ্টতা পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারে না, কারণ সেই সঙ্গে তাদের দংশনের কষ্টও অনুভব করতে হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জীবকে এই জড় জগতে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়, কিন্তু তাদের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত পরমেশ্বর ভগবান তাদের থেকে পৃথক থাকেন। *উপনিষদে* একটি বৃক্ষে দুটি পক্ষীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। একটি পক্ষী (জীব) সেই গাছের ফল উপভোগ করছে, এবং অন্য পক্ষী (পরমাত্মা) কেবল সাক্ষীরূপে রয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/২৩) পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে *উপদ্রষ্টা* ও *অনুমন্তা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এইভাবে ভগবান কেবল সাক্ষী থেকে জীবের ইন্দ্রিয়-সুখভোগের অনুমতি প্রদান করেন। পরমাত্মাই জীবকে বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা মৌমাছি মৌচাক তৈরি করতে পারে, বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে, এবং সেগুলি সঞ্চয় করে উপভোগ করতে পারে। যদিও পরমাত্মা জীব থেকে পৃথক থাকেন, তবুও তিনি তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন, যার দ্বারা তারা তাদের কর্মের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে পারে। মানব-সমাজ ঠিক একটি মৌচাকের মতো, কারণ সকলেই বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহের কার্যে ব্যস্ত, অথবা বিভিন্ন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যাপারে ব্যস্ত। এইভাবে তারা যৌথভাবে উপভোগ করার জন্য এক বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, এই সাম্রাজ্য সৃষ্টি করার পর, অন্য রাষ্ট্রের দংশনও তাদের ভোগ করতে হয়। কখনও কখনও এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং তখন মানুষের তৈরি মৌচাক দুঃখ-কষ্টের উৎসরূপে পরিণত হয়। মানুষেরা যদিও তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য তাদের মৌচাক রচনা করছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের অন্যান্য মানুষদের অথবা রাষ্ট্রের দংশনের বেদনাভোগ করতে হচ্ছে। পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত কার্যকলাপের কেবল সাক্ষীরূপে রয়েছেন। মূল কথা হচ্ছে যে, ভগবান ও জীব উভয়েই জড় জগতে প্রবেশ করেন। কিন্তু পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আরাধ্য, কারণ তিনি এই

জড় জগতে জীবের সুখভোগের সমস্ত আয়োজন করেছেন। কিন্তু যেহেতু এটি জড় জগৎ, তাই কেউই দুঃখকষ্ট ব্যতীত এইখানে সুখভোগ করতে পারে না। জড় সুখ মানেই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা, কিন্তু চিন্ময় আনন্দে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা নেই। সেখানে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের সংরক্ষণে বিশুদ্ধ আনন্দ।

শ্লোক ৬৫

স এষ লোকানতিচণ্ডবেগো
বিকর্ষসি ত্বং খলু কালয়ানঃ ।
ভূতানি ভূতৈরনুমেয়তত্ত্বো
ঘনাবলীর্বায়ুরিবাবিষহ্যঃ ॥ ৬৫ ॥

সঃ—সেই; **এষঃ**—এই; **লোকান্**—সমস্ত ভুবন; **অতি**—অত্যন্ত; **চণ্ড-বেগঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **বিকর্ষসি**—ধ্বংস করে; **ত্বম্**—আপনি; **খলু**—তা সত্ত্বেও; **কালয়ানঃ**—যথাসময়ে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভূতৈঃ**—অন্য জীবদের দ্বারা; **অনুমেয়-তত্ত্বঃ**—পরমতত্ত্ব, যা অনুমান করা যায়; **ঘন-আবলীঃ**—মেঘসমূহ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **অবিষহ্যঃ**—অসহ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার পরম ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, কিন্তু এই জগতে যে সবকিছু কালের প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তা দেখে তা অনুমান করা যায়। কালের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড, এবং সবকিছুই অন্য কিছুর দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়—ঠিক যেমন একটি পশু আর একটি পশুকে আহার করে। বায়ু যেমন আকাশের মেঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, ঠিক সেইভাবে কাল সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতির নিয়মে ধ্বংসকার্য সংঘটিত হয়। এই জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, যদিও বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্মী ও অন্য সকলে সর্বদা সবকিছু চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করছে। এক মূর্খ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, বিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবনকে চিরস্থায়ী করা যাবে। তথাকথিত কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে জীব সৃষ্টিরও চেষ্টা করছে। এইভাবে সকলেই কোন না কোনভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভগবান

এতই শক্তিশালী যে, তিনি মৃত্যুরূপে সব কিছু ধ্বংস করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৩৪) সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু।" নাস্তিকদের কাছে ভগবান হচ্ছেন মৃত্যু, এবং জড় জগতে তারা যা কিছু সঞ্চয় করে, তা সব তিনি তাদের থেকে হরণ করে নেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু সর্বদা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করত, এবং ভগবানের প্রতি প্রহ্লাদের অবিচলিত ভক্তির জন্য সে পাঁচ বছরের শিশু প্রহ্লাদকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, যথাসময়ে ভগবান নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হয়ে, হিরণ্যকশিপুকে তার পুত্রের উপস্থিতিতে সংহার করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/৪৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই মৃত্যুর পন্থা স্বাভাবিক। *জীব জীবস্য জীবনম্*—"একটি জীব অন্য আর একটি জীবের খাদ্য।" সাপ ব্যাঙ খায়, বেজি সাপ খায়, আর অন্য আর একটি পশু বেজিকে খায়। এইভাবে ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ধ্বংসের ক্রিয়া চলছে। যদিও আমরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের হাত দেখতে পাই না, কিন্তু এই ধ্বংসকার্যের মাধ্যমে আমরা ভগবানের হাতের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। আমরা বায়ুর দ্বারা মেঘকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখি, কিন্তু যদিও তা কিভাবে হচ্ছে তা আমরা দেখতে পাই না, কারণ বায়ুকে দেখা যায় না। তেমনই, যদিও আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারি না, তবুও ধ্বংস-ক্রিয়ার মাধ্যমে দেখা যায়, কিভাবে তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভয়ঙ্করভাবে এই ধ্বংসকার্য চলছে, কিন্তু নাস্তিকেরা তা দেখতে পায় না।

শ্লোক ৬৬

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রমত্তম্—যারা উন্মাদ; **উচ্চৈঃ**—উচ্চস্বরে; **ইতি**—এইভাবে; **কৃত্য**—করণীয়; **চিন্তয়া**—এই প্রকার বাসনার দ্বারা; **প্রবৃদ্ধ**—অত্যন্ত উন্নত; **লোভম্**—লোভ; **বিষয়েষু**—জড় সুখভোগে; **লালসম্**—বাসনা করে; **ত্বম্**—আপনি; **অপ্রমত্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে; **সহসা**—সহসা; **অভিপদ্যসে**—ধারণ করে; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধার্ত; **লেলিহানঃ**—লোভার্ত জিহ্বার দ্বারা; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **আখুম্**—মূষিক; **অন্তকঃ**—ধ্বংসকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান! এই জড় জগতে সমস্ত জীবই বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রমত্ত, এবং তারা সর্বদাই কিছু না কিছু করার বাসনায় ব্যস্ত। তার কারণ হচ্ছে দুর্দমনীয় লোভ। জড়-জাগতিক সুখভোগের জন্য এই লোভ জীবের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান আপনি কালরূপে তাদের আক্রমণ করেন, ঠিক যেভাবে একটি সর্প অনায়াসে একটি মূষিককে গ্রাস করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই লোভী, এবং সকলেই জড় সুখভোগের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করে। জড় সুখভোগের লালসার ফলে, জীবকে প্রমত্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥

"প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই সংঘটিত হয় প্রকৃতির দ্বারা।"

সব কিছুই সম্পন্ন হয় প্রকৃতির নিয়মে, এবং সেই নিয়মগুলি ভগবানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। নাস্তিকেরা বা নির্বোধেরা সেই কথা জানে না। তারা তাদের নিজেদের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকে, আর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্যস্ত থাকে। যদিও আমরা জানি যে, কালের প্রভাবে বহু বড় বড় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে। মানুষের চরম উন্মত্ততায় বহু বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে সেই সমস্ত পরিবার ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্খ নাস্তিকেরা ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করতে চায় না। এই প্রকার মূর্খ মানুষেরা ভগবানের পরম অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে অনর্থক নিজেদের মনগড়া সমস্ত কর্তব্য সৃষ্টি করে। তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাষ্ট্রের জড়-জাগতিক উন্নতি-সাধনের জন্য নানা রকম পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা কেবল তাদের নিজেদের উচ্চ পদই আকাঙ্ক্ষা করে। জড়-জাগতিক উচ্চ পদের লোভে, তারা নিজেদের জনসাধারণের নেতা রূপে উপস্থাপিত করে তাদের ভোট সংগ্রহ করে, যদিও তারা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন। এইগুলি হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কয়েকটি ভ্রান্তি। ভগবানের অধ্যক্ষতা স্বীকার না করে এবং

ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, জীবেরা বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধনের অবৈধ পরিকল্পনার ফলে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন দ্রব্যমূল্য এতই বৃদ্ধি হচ্ছে যে, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে জীবন-ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে, এবং তার ফলে তারা প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। কৃষ্ণভক্তির অভাবে মানুষেরা তথাকথিত নেতা ও পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। তার ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রকৃতির নিয়মে, এই জড় জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়; তাই সকলেরই কর্তব্য নিজেদের রক্ষা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। এই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"ঋষিগণ আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার চরম উদ্দেশ্য, সমস্ত গ্রহলোক ও সমস্ত দেবতাদের মহেশ্বর, এবং সমস্ত জীবের সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে জেনে, জড় জগতের দুঃখদুর্দশা থেকে শান্তিলাভ করেন।"

সমাজে কেউ যদি মনের শান্তিলাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর অধীশ্বর হচ্ছেন তিনি, এবং তিনি আবার সমস্ত জীবের পরম বন্ধু। সেই কথা জানার ফলে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সুখী হতে পারে এবং শান্তিলাভ করতে পারে।

শ্লোক ৬৭

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্গুরুর্যচতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দশ ॥ ৬৭ ॥

কঃ—কে; **ত্বৎ**—আপনার; **পদ-অব্জম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিজহাতি**—উপেক্ষা করে; **পণ্ডিতঃ**—পণ্ডিত; **যঃ**—যিনি; **তে**—আপনাকে; **অবমান**—অবমাননা করে; **ব্যয়মান**—হ্রাস করে; **কেতনঃ**—এই শরীর; **বিশঙ্কয়া**—নিঃসন্দেহে; **অস্মৎ**—আমাদের; **গুরুঃ**—গুরুদেব, পিতা; **অর্চতি**—আরাধনা করে; **স্ম**—অতীতে; **যৎ**—যা; **বিনা**—ব্যতীত; **উপপত্তিম্**—বিক্ষোভ; **মনবঃ**—মনুগণ; **চতুঃ-দশ**—চৌদ্দ।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে-কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন যে, আপনার আরাধনা না করলে সমগ্র জীবন ব্যর্থ হয়। সেই কথা জানা সত্ত্বেও, কিভাবে তিনি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা ত্যাগ করতে পারেন? এমন কি আমাদের পিতা এবং গুরুদেব ব্রহ্মাও নির্দ্বিধায় আপনার আরাধনা করেছেন, এবং চতুর্দশ মনুগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

তাৎপর্য

পণ্ডিত শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তি। প্রকৃত জ্ঞানী কে? জ্ঞানীর বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এইভাবে বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, মানুষ যখন আত্ম-উপলব্ধির জন্য খামখেয়ালীপূর্ণ সমস্ত প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখনই তিনি প্রকৃত জ্ঞানী হন। এই প্রকার *মহাত্মা* বা জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছু (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*)। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করা হলে অথবা তাঁর ভক্ত না হলে, জীবন ব্যর্থ হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, কেউ যখন উন্নত ভক্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে সংযত ও ধৈর্যশীল (*ক্ষান্তিঃ*) হওয়া উচিত এবং কখনও সময়ের অপচয় না করে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত (*অব্যর্থ-কালত্বম্*)। তাঁকে সমস্ত জড় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত (*বিরক্তি*), এবং তাঁর কার্যকলাপের বিনিময়ে কোন প্রকার সম্মান কামনা করা উচিত নয় (*মান-শূন্যতা*)। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করবেন (*আশাবন্ধঃ*), এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবা করার জন্য সর্বদা অত্যন্ত উৎসুক থাকা উচিত (*সমুৎকণ্ঠা*), জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা কীর্তন ও শ্রবণের মাধ্যমে ভগবানের মহিমা আস্বাদন করতে উৎসুক (*নামগানে সদা রুচিঃ*), এবং তিনি সর্বদা ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করতে উৎসুক (*আসক্তিস্তদ্-গুণাখ্যানে*)। যে-সমস্ত স্থানে ভগবান তাঁর লীলাবিলাস করেছেন, সেই সমস্ত স্থানের প্রতিও তাঁর অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়া উচিত (*প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে*)। এইগুলি উন্নত স্তরের ভক্তের লক্ষণ।

উত্তম ভক্ত বা পূর্ণ চেতনা সমন্বিত মানুষ, যিনি প্রকৃতই জ্ঞানবান, তিনি কখনও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা পরিত্যাগ করতে পারেন না। ব্রহ্মার আয়ু যদিও অত্যন্ত দীর্ঘ (চারশ বত্রিশ কোটি বছর হচ্ছে ব্রহ্মার দিনের বার ঘণ্টা), তবু ব্রহ্মাও মৃত্যুর ভয়ে ভীত এবং তার ফলে সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তেমনই, ব্রহ্মার একদিনে যে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাঁরাও ভগবানের সেবায় যুক্ত। প্রথম মনু হচ্ছেন স্বায়ম্ভুব মনু। প্রত্যেক মনুর আয়ু হচ্ছে একাত্তর চতুর্যুগ এবং এক-একটি চতুর্যুগের স্থিতি হচ্ছে ৪৩,২০,০০০ বছর। যদিও মনুদের আয়ুষ্কাল এতই দীর্ঘ, তবুও তাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থেকে, পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেন। এইযুগে মানুষের আয়ু হচ্ছে বড় জোর সত্তর-আশি বছর, এবং এই স্বল্প আয়ুও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। তাই মানুষদের পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করা অধিকতর কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন---

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(*শিক্ষাষ্টক* ৩)

কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তাঁর চারপাশে ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, এবং কখনও কখনও তাঁর শত্রুরা তাঁকে পরাস্ত করতে চেষ্টা করে অথবা তাঁর ভগবদ্ভক্তি বন্ধ করতে চেষ্টা করে। কেবল বর্তমান যুগেই নয়, পুরাকালেও প্রহ্লাদ মহারাজ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতিত করে। নাস্তিকেরা সর্বদাই ভক্তদের নির্যাতন করতে প্রস্তুত থাকে; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত মানুষদের প্রতি অত্যন্ত সহিষ্ণু হতে। এই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও প্রচার করে যেতে হবে, কারণ এই প্রচার ও কীর্তনই হচ্ছে জীবনের সিদ্ধি। জীবনকে সর্বতোভাবে পূর্ণ করা যে কত জরুরী, সেই সম্বন্ধে প্রচার করা উচিত। ব্রহ্মা আদি পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় এইভাবে যুক্ত হওয়া কর্তব্য।

শ্লোক ৬৮

অথ ত্বমসি নো ব্রহ্মন্ পরমাত্মন্ বিপশ্চিতাম্ ।
বিশ্বং রুদ্রভয়ধ্বস্তমকুতশ্চিদ্ভয়া গতিঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ—অতএব; **ত্বম্**—আপনি, হে ভগবান; **অসি**—হন; **নঃ**—আমাদের; **ব্রহ্মন্**—হে পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **বিপশ্চিতাম্**—বিদ্বান ও জ্ঞানবান মানুষদের জন্য; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **রুদ্র-ভয়**—রুদ্রের ভয়ে; **ধ্বস্তম্**—ধ্বংস হয়; **অকুতশ্চিৎ-ভয়া**—নিশ্চিতরূপে নির্ভয়; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! যে-সমস্ত মানুষ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান, তাঁরা আপনাকে পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে জানেন। যদিও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চরমে সব কিছুর সংহারকারী রুদ্রের ভয়ে ভীত, কিন্তু আপনার জ্ঞানবান ভক্তের কাছে আপনিই হচ্ছেন নির্ভয় আশ্রয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের জন্য তিনজন দেবতা হচ্ছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (*মহেশ্বর*)। প্রলয়ের সময় জড় দেহের বিনাশ হয়ে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর ও জীবের ক্ষুদ্র শরীর, উভয়েই চরমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহের বিনাশের ভয়ে ভক্ত কখনও ভীত হন না, কারণ তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, দেহের বিনাশের পর, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁর আর মৃত্যুভয় থাকে না, কারণ তাঁর ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। অভক্তরা মৃত্যুর ভয়ে ভীত, কারণ তারা যে পরবর্তী জীবনে কোথায় যাবে এবং কি ধরনের শরীর প্রাপ্ত হবে, সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। এই শ্লোকে *রুদ্র-ভয়* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ রুদ্র স্বয়ং শিব, যিনি নিজেই 'রুদ্রের ভয়ের' কথা বলছেন। তা ইঙ্গিত করে যে, বহু রুদ্র রয়েছেন—একাদশ রুদ্র, এবং যে রুদ্র এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রার্থনা নিবেদন করছেন, তিনি অন্য রুদ্রদের থেকে ভিন্ন, যদিও তিনি তাঁদেরই মতো সমান শক্তিসম্পন্ন। মূল কথা হচ্ছে যে, একজন রুদ্র অন্য রুদ্রদের ভয়ে ভীত, কারণ তাঁরা সকলেই এই জড় জগতের ধ্বংসকার্যে লিপ্ত। কিন্তু ভক্ত কখনও রুদ্রের ভয়ে ভীত নন, কারণ তিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে থাকার ফলে সুরক্ষিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে অর্জুন! তুমি সকলের কাছে ঘোষণা কর যে, আমার শুদ্ধ ভক্ত কোন পরিস্থিতিতেই বিনষ্ট হবে না।"

শ্লোক ৬৯

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥ ৬৯ ॥

ইদম্—এই; **জপত**—জপ করার সময়; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে কল্যাণ; **বঃ**—তোমরা সকলে; **বিশুদ্ধাঃ**—বিশুদ্ধ; **নৃপ-নন্দনাঃ**—রাজপুত্রগণ; **স্ব-ধর্মম্**—স্বীয় বৃত্তিকারক ধর্ম; **অনুতিষ্ঠন্তঃ**—সম্পাদন করে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অর্পিত**—অর্পণ করে; **আশয়াঃ**—সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা সমন্বিত।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ! তোমরা সকলে বিশুদ্ধ হৃদয়ে তোমাদের রাজোচিত কর্তব্য সম্পাদন কর। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মন স্থির করে তোমরা এই মন্ত্র জপ কর। তার ফলে ভগবান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন, এবং তাতে তোমাদের সর্বতোভাবে মঙ্গল হবে।

তাৎপর্য

ভগবানের উদ্দেশ্যে শিবের এই প্রার্থনা অত্যন্ত প্রামাণিক ও মহত্ত্বপূর্ণ। স্বীয় কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া। মানুষ কোন্ সামাজিক স্থিতিতে রয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। তা তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আমেরিকান, ইংরেজ, ভারতীয় ইত্যাদি যাই হোন না কেন, তিনি যে-কোন স্থানে এবং যে-কোন অবস্থায় ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রও হচ্ছে একটি প্রার্থনা, কারণ প্রার্থনা করা হয় ভগবানের নামের দ্বারা ভগবানকে সম্বোধন করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রতে বলা হয়, "হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! হে রাম! হে ভগবানের শক্তি হরে! দয়া করে আমাকে আপনার সেবায় যুক্ত করুন।" কেউ যদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থিতিতেও থাকেন, তিনিও যে-কোন পরিস্থিতিতেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন, যে-সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অহৈতুকী অপ্রতিহতা*—"ভগবদ্ভক্তি কোন জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৬) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই পন্থা উপদেশ দিয়ে গেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥
(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১৪/৩)

মানুষ তার স্বীয় স্থানে থেকে অথবা তার বৃত্তিকারক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করছি, যাতে সকলেই ভগবানের বাণী শ্রবণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়।

শ্লোক ৭০

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৭০ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **আত্ম-স্থম্**—তোমাদের হৃদয়-অভ্যন্তরে; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রতিটি জীবে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **পূজয়ধ্বম্**—পূজা কর; **গৃণন্তঃ চ**—সর্বদা কীর্তন করে; **ধ্যায়ন্তঃ চ**—সর্বক্ষণ ধ্যান করে; **অসকৃৎ**—নিরন্তর; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

অতএব, হে রাজকুমারগণ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি তোমাদের হৃদয়েও অবস্থিত। অতএব সর্বক্ষণ তাঁর মহিমা কীর্তন কর এবং নিরন্তর তাঁর ধ্যান কর।

তাৎপর্য

অসকৃৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং ধ্যান কেবল কিছুক্ষণের জন্যই করণীয় নয়, তা 'নিরন্তর' করা কর্তব্য। সেই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ* — "ভগবানের দিব্য নাম দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই করা উচিত।" তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা ভক্তদের প্রতিদিন কমপক্ষে ষোলমালা জপ করার উপদেশ দিই। প্রকৃতপক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের নাম কীর্তন করা

উচিত, ঠিক যেভাবে হরিদাস ঠাকুর করতেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর আর অন্য কোন কৃত্য ছিল না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী আদি গোস্বামীগণও অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নাম জপ করতেন এবং প্রণতি নিবেদন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর *ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকে* বলেছেন—*সংখ্যাপূর্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ। সংখ্যাপূর্বক* মানে হচ্ছে 'নির্দিষ্ট সংখ্যা স্থির রেখে'। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনই করতেন না, তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রণতিও নিবেদন করতেন।

যেহেতু রাজকুমারেরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই শিব তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করতে এবং ভগবানের ধ্যান করতে। শিব যে স্বয়ং তাঁর পিতা ব্রহ্মার শিক্ষা অনুসারে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরম্পরা ধারায় রাজকুমারদের কাছেও সেই উপদেশই দিয়েছিলেন। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে চলাই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞান শিষ্যদের কাছে বিতরণ করাও কর্তব্য।

আত্মানম্ আত্মস্থং সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ শব্দগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। জীবেরা যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই ভগবান তাদের সকলেরই পিতা। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত বলে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। এই শ্লোকে ভগবানকে আরাধনা করার বিধি অত্যন্ত সরল এবং পূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন স্থানে উপবিষ্ট হয়ে, জীবনের যে-কোন অবস্থায় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে পারেন। শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা অনায়াসে ভগবানের ধ্যান করা যায়।

শ্লোক ৭১

যোগাদেশমুপাসাদ্য ধারয়ন্তো মুনিব্রতাঃ ।
সমাহিতধিয়ঃ সর্ব এতদভ্যসতাদৃতাঃ ॥ ৭১ ॥

যোগ-আদেশম্—ভক্তিযোগের এই নির্দেশ; **উপাসাদ্য**—নিরন্তর পাঠ করে; **ধারয়ন্তঃ**—হৃদয়ে ধারণ করে; **মুনিব্রতাঃ**—মহান মুনিদের ব্রত গ্রহণ করে, মৌনব্রত অবলম্বন করে; **সমাহিত**—সর্বদা চিত্ত স্থির রেখে; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধির দ্বারা; **সর্বে**—তোমরা সকলে; **এতৎ**—এই; **অভ্যসত**—অভ্যাস কর; **আদৃতাঃ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা রূপে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যোগপদ্ধতি বর্ণনা করেছি। তোমরা সকলে এই মহত্ত্বপূর্ণ স্তোত্র মনে ধারণ করে তাতে সমাহিত থাকার ব্রত গ্রহণ করার মাধ্যমে মহান ঋষি হও। মুনিদের মতো মৌনব্রত অবলম্বন করে, তোমরা গভীর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই পন্থা অনুশীলন কর।

তাৎপর্য

হঠযোগের পদ্ধতিতে আসন, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি দৈহিক ব্যায়ামের অভ্যাস করতে হয়। কোন বিশেষ আসনে একস্থানে বসে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে মনকে একাগ্রীভূতও করতে হয়। হঠযোগের পদ্ধতিতে এত বিধিবিধান রয়েছে যে, তা এই যুগে অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। তার বিকল্প পদ্ধতি ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল। এই পন্থাটি কেবল এই যুগের জন্যই নয়, তা অন্যান্য যুগের জন্যও, কারণ এই যোগপদ্ধতি বহুকাল পূর্বে শিব মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন। ভক্তিযোগের পদ্ধতি কোন নবীন পন্থা নয়, কারণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগকে সর্বোত্তম যোগপদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক দিব্য প্রেম সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী এবং তিনি সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত।"

সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তাঁর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। অর্থাৎ, এই ভক্তিযোগের পদ্ধতি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে এবং এখন তা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচলিত হচ্ছে।

এই সম্পর্কে *মুনিব্রতাঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে মৌন থাকা কর্তব্য। মৌন থাকার অর্থ হচ্ছে কেবল কৃষ্ণকথা বলা। মহারাজ অম্বরীষ এই প্রকার মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ॥

"মহারাজ অম্বরীষ তাঁর মনকে সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির রেখেছিলেন এবং তিনি কেবল তাঁর মহিমা কীর্তন করতেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৯/৪/১৯) আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে এই জীবনের সুযোগ গ্রহণ করে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অনর্থক বাক্যালাপ না করে একজন মহামুনির মতো হওয়া। আমাদের উচিত কেবল শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা অথবা অবিচলিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তাকে বলা হয় *মুনিব্রত* । বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত (*সমাহিত-ধিয়ঃ*) এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম করা উচিত। *এতদ্ অভ্যসতাদৃতাঃ* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যদি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে (আদৃত) গুরুদেবের এই উপদেশ পালন করেন এবং যথাযথভাবে তা আচরণ করেন, তা হলে তাঁর কাছে এই ভক্তিযোগের পন্থা অত্যন্ত সরল হয়ে যাবে।

শ্লোক ৭২

ইদমাহ পুরাস্মাকং ভগবান্ বিশ্বসৃক্পতিঃ ।
ভৃগ্বাদীনামাত্মজানাং সিসৃক্ষুঃ সংসিসৃক্ষতাম্ ॥ ৭২ ॥

ইদম্—এই; **আহ**—বলা হয়েছে; **পুরা**—পূর্বে; **অস্মাকম্**—আমাদের; **ভগবান্**—ভগবান; **বিশ্ব-সৃক্**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **পতিঃ**—প্রভু; **ভৃগু-আদীনাম্**—ভৃগু আদি মহর্ষিদের; **আত্মজানাম্**—তাঁর পুত্রদের; **সিসৃক্ষুঃ**—সৃষ্টি করার ইচ্ছায়; **সংসিসৃক্ষতাম্**—সৃষ্টিকার্যের অধ্যক্ষ।

অনুবাদ

সমস্ত প্রজাপতিদের প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে আমাদের এই স্তোত্রটি বলেছিলেন। সৃষ্টিকার্যে ইচ্ছুক ভৃগু আদি প্রজাপতিদেরও এই স্তোত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন; ব্রহ্মা তার পর শিব ও ভৃগু মুনি আদি অন্যান্য মহর্ষিদের সৃষ্টি করেছেন। এই মহর্ষিরা হচ্ছেন—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, বসিষ্ঠ আদি। এই সমস্ত মহর্ষিগণ প্রজাসৃষ্টির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত। শুরুতে যেহেতু খুব বেশি জীব ছিল না, তাই বিষ্ণু সন্তান উৎপাদনের দায়িত্ব ব্রহ্মার উপর অর্পণ করেছিলেন, এবং

ব্রহ্মা সেই দায়িত্ব শত-সহস্র দেবতা ও মহর্ষিদের উপর অর্পণ করেছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা তাঁর পুত্র ও শিষ্যদের এই স্তোত্র উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি শিব এখানে গেয়েছেন। জড় সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ, কিন্তু শিব এখানে যে স্তোত্রটি গেয়েছেন, সেই বর্ণনা অনুসারে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা নিরন্তর স্মরণ করার ফলে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রভাব প্রতিহত করা যায়। এইভাবে আমরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে থাকতে পারি। তার ফলে সৃষ্টিকার্যে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থায় অবিচলিত থাকতে পারি। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। জড় জগতে সকলেই বর্ণাশ্রম-ধর্মে নির্দিষ্ট কোন বিশেষ বৃত্তিতে যুক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সকলেই তাদের বৃত্তিতে যুক্ত, কিন্তু কেউ যদি তার প্রথম কর্তব্য—নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার কথা স্মরণে রাখেন, তা হলে সব কিছুই সার্থক হবে। কেউ যদি কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্ররূপে বর্ণাশ্রম-ধর্মের বিধিবিধান অনুসারে তাঁর কর্তব্যকর্মে যুক্ত থাকেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ না করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত বৃত্তি, কার্যকলাপ ও ধর্ম-অনুষ্ঠান কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৮), প্রথম স্কন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

মূল কথা হচ্ছে যে, কেউ যদি তাঁর বৃত্তিগত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তা হলেও অপ্রতিহতভাবে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করে যাওয়া উচিত। কেবলমাত্র শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। বৃত্তিগত ধর্ম পরিত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

"সমস্ত জীবের উৎস এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার দ্বারা মানুষ তার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে।"

এইভাবে কেউ তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু এখানে দেওয়া শিবের নির্দেশ অনুসারে তিনি যদি ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৩)। আমাদের কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যদি আমাদের সেই কর্তব্যকর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৭৩

তে বয়ং নোদিতাঃ সর্বে প্রজাসর্গে প্রজেশ্বরাঃ ।
অনেন ধ্বস্ততমসঃ সিসৃক্ষ্মো বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৩ ॥

তে—তাঁর দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **নোদিতাঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **প্রজা-সর্গে**—প্রজা সৃষ্টির সময়; **প্রজা-ঈশ্বরাঃ**—প্রজাপতিরা; **অনেন**—এর দ্বারা; **ধ্বস্ত-তমসঃ**—সর্বপ্রকার অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে; **সিসৃক্ষ্মঃ**—আমরা সৃষ্টি করেছিলাম; **বিবিধাঃ**—নানা প্রকার; **প্রজাঃ**—জীব।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন সমস্ত প্রজাপতিদের প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে এই স্তোত্র গেয়েছিলাম এবং সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এইভাবে আমরা বিবিধ প্রকার জীব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সৃষ্টির শুরুতেই একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জীবদের সৃষ্টি হয়েছিল। ডারউইনের অর্থহীন বিবর্তনবাদ এখানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এমন নয় যে, কোটি-কোটি বছর আগে বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষেরা ছিল না। পক্ষান্তরে, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল সর্বপ্রথমে। ব্রহ্মা তার পর মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ আদি মহর্ষিদের এবং শিবকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর তাঁরা জীবের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহূতিকে বলেছেন যে, জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তা নির্ধারিত হয় উচ্চতর অধিকারিদের দ্বারা। এই সমস্ত উচ্চতর অধিকারিরা ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত হন, এবং তাঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, অন্যান্য প্রজাপতি ও মনুগণ। এইভাবে দেখা যায় যে, সৃষ্টির শুরুতে প্রথম সৃষ্ট জীব হচ্ছেন সব চাইতে বুদ্ধিমান। এমন নয় যে, তথাকথিত আধুনিক বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে বিবর্তনের

মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* ক্রমিক বিবর্তনের বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সেই বিবর্তন দেহের বিবর্তন নয়। সর্বপ্রকার দেহ শুরু থেকেই রয়েছে। দেহের মধ্যে রয়েছে যে চিন্ময় আত্মা বা চিৎস্ফুলিঙ্গ তা প্রকৃতির নিয়মে এবং উচ্চতর অধিকারিদের অধ্যক্ষতায় ক্রমশ উন্নততর শরীর প্রাপ্ত হচ্ছে। এই শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সৃষ্টির প্রথম থেকেই বিবিধ প্রকার জীব রয়েছে। এমন নয় যে, তাদের কেউ কেউ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুই রয়েছে; কেবল আমাদের জ্ঞানের অভাবে আমরা বস্তুর বাস্তবিক রূপ দর্শন করতে পারছি না।

এই শ্লোকে *ধ্বস্ততমসঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তমোগুণ থেকে মুক্ত না হলে, আমরা বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩১/১) বলা হয়েছে, *দৈবনেত্রেণ*—উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন দেবতাদের অধ্যক্ষতায় জীব তার দেহ প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত দেবতারা যদি সব রকম ত্রুটি থেকে মুক্ত না হন, তা হলে কিভাবে তাঁরা জীবের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? বৈদিক নির্দেশের অনুগামীরা কখনও ডারউইনের বিবর্তনবাদ স্বীকার করতে পারেন না, কারণ তার সেই মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

শ্লোক ৭৪

অথেদং নিত্যদা যুক্তো জপন্নবহিতঃ পুমান্ ।
অচিরাচ্ছ্রেয় আপ্নোতি বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৭৪ ॥

অথ—এইভাবে; **ইদম্**—এই; **নিত্যদা**—নিয়মিতভাবে; **যুক্তঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **জপন্**—জপ করার দ্বারা; **অবহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **পুমান্**—মানুষ; **অচিরাৎ**—অবিলম্বে; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **বাসুদেব-পরায়ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, যাঁর মন সর্বদা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে, যিনি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে এই স্তোত্র জপ করেন, তিনি অচিরেই জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

সিদ্ধি মানে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/২৮) প্রথম স্কন্ধে বলা হয়েছে—*বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ* । জীবনের চরম

লক্ষ্য হচ্ছেন বাসুদেব বা কৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন ভক্ত কেবল তাঁর বন্দনা করার মাধ্যমে সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, জাগতিক বিষয় প্রাপ্ত হতে পারেন, এবং মুক্তিলাভ করতে পারেন। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান পুরুষেরা এবং মহর্ষিরা নানাভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৫/৩৩)। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছেন শিব ও বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মা, এবং তাঁরা উভয়েই ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেন। আমরা যদি এই প্রকার মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হই, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। দুর্ভাগ্যবশত মানুষেরা এই রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—"তারা জানে না যে, জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন এবং পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (কৃষ্ণের) পূজা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১) ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে কখনও সুখী হওয়া যায় না। কৃষ্ণভক্ত না হলে, আমাদের প্রতি পদক্ষেপে ব্যর্থ হতে হবে এবং বিভ্রান্ত হতে হবে। এই সংকট থেকে জীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকেই সব কিছু জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

কেবলমাত্র বাসুদেবের ভক্ত হয়ে আমরা যে-কোন বর লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৭৫

শ্রেয়সামিহ সর্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্ ॥ ৭৫ ॥

শ্রেয়সাম্—সর্বপ্রকার কল্যাণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত মানুষের; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **নিঃশ্রেয়সম্**—চরম মঙ্গল; **পরম্**—দিব্য; **সুখম্**—সুখ; **তরতি**—উত্তীর্ণ হয়; **দুষ্পারম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **নৌঃ**—নৌকা; **ব্যসন**—বিপদ; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

এই জড় জগতে যত প্রকার কল্যাণ রয়েছে, তার মধ্যে জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ করে, দুর্লঙ্ঘ্য সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তা ছাড়া এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের ফলে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানহীন মানুষ নানা প্রকার অপরাধজনক কার্য করছে এবং তার ফলে কারারুদ্ধ হয়ে দণ্ডভোগ করছে, যদিও সে তার পাপকর্ম সম্বন্ধে হয়তো সচেতন নয়। এই প্রকার অজ্ঞানতা সারা জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে। মানুষ বিবেচনা করে দেখে না, অবৈধ যৌনসঙ্গের চেষ্টার দ্বারা, জিহ্বার তৃপ্তিসাধনের জন্য পশুহত্যা করে, আসব পান করে এবং জুয়া খেলে তারা কিভাবে তাদের জীবন বিপন্ন করছে। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই পৃথিবীর নেতারা এই সমস্ত পাপকর্মের পরিণাম যে কি তা জানে না। পক্ষান্তরে তারা এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করছে এবং তার ফলে অজ্ঞানের সমুদ্রের পরিধি বর্ধিত করছে।

এই অজ্ঞানের বিপরীত হচ্ছে পূর্ণজ্ঞান, এবং তা এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমরা ব্যবহারিকভাবে দেখতে পাই যে, যাঁরা জ্ঞানবান, তাঁরা জীবনের অনেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পান। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বলা হয়েছে, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*—"কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।" *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*—"এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন তথাকথিত সমস্ত নেতাদের চোখ খুলে দিয়ে, তাদের জীবনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। সবচাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে মনুষ্যেতর জীবন প্রাপ্ত হওয়া। বহু কষ্টে এই মনুষ্য শরীর লাভ হয়েছে, যাতে এই শরীরের সদ্ব্যবহার করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। শিব উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি এই স্তোত্রের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হতে পারবেন এবং তার ফলে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর জীবন সার্থক করতে পারবেন।

শ্লোক ৭৬

য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্‌গীতং ভগবৎস্তবম্ ।
অধীয়ানো দুরারাধ্যং হরিমারাধয়ত্যসৌ ॥ ৭৬ ॥

যঃ—যে-কেউ; **ইমম্**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—গভীর আসক্তিসহ; **মৎ-গীতম্**—আমি যে গানটি গেয়েছি; **ভগবৎ-স্তবম্**—পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা; **অধীয়ানঃ**—নিয়মিত পাঠ করার দ্বারা; **দুরারাধ্যম্**—যাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আরাধয়তি**—আরাধনা করতে পারেন; **অসৌ**—এই প্রকার ব্যক্তি।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তি করা এবং তাঁর আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও কেউ যদি আমার দ্বারা রচিত ও গীত এই স্তোত্র কেবল পাঠ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

শিব যে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত, তা এখানে বিশেষভাবে বোঝা যাচ্ছে। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—"সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।" সেই সূত্রে শিবের একটি সম্প্রদায় রয়েছে, একটি বৈষ্ণব পরম্পরা রয়েছে, যার নাম হচ্ছে রুদ্র-সম্প্রদায়। এখন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা এই রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবের ভক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সেই সম্পর্কে এখানে *দুরারাধ্যম্* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। দেবতাদের পূজা করা খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া তত সহজ নয়। কিন্তু, কেউ যদি শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করেন এবং মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, যে উপদেশ শিব দিয়েছেন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হতে পারেন। সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজও প্রতিপন্ন করেছেন। মনোধর্মের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায় না। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে একটি বিশেষ প্রাপ্তি, যা কেবল শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়ার ফলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ*—"সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তের চরণ-রেণুর দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)

শ্লোক ৭৭

বিন্দতে পুরুষোঽমুষ্মাদ্‌যদ্‌যদিচ্ছত্যসত্বরম্ ।
মদ্‌গীতগীতাৎসুপ্রীতাচ্ছ্রেয়সামেকবল্লভাৎ ॥ ৭৭ ॥

বিন্দতে—লাভ করে; **পুরুষঃ**—ভক্ত; **অমুষ্মাৎ**—ভগবান থেকে; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ইচ্ছতি**—কামনা করেন; **অসত্বরম্**—স্থির হয়ে; **মৎ-গীত**—আমার দ্বারা গীত; **গীতাৎ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **সু-প্রীতাৎ**—ভগবান থেকে, যিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন; **শ্রেয়সাম্**—সমস্ত মঙ্গলের; **এক**—এক; **বল্লভাৎ**—প্রিয়তম থেকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত মঙ্গলময় আশীর্বাদের মধ্যে প্রিয়তম বস্তু। যে ব্যক্তি আমার দ্বারা গীত এই সঙ্গীত গান করেন, তিনি ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এই প্রকার ভক্ত ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হয়ে ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করেন, তাই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৬/২২) বলা হয়েছে, *যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ* —কেউ যদি ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হন, তা হলে তাঁর আর আকাঙ্ক্ষা করার মতো কিছু থাকে না, এবং তিনি আর অন্য কোন কিছু লাভের আশাও করেন না। ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যার প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর ঈপ্সিত যে-কোন বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন যে, ভগবানকে দর্শন করে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছেন, তাই তাঁর আর চাওয়ার মতো কিছুই নেই। ভগবানের সেবা ব্যতীত আমরা যা কিছু চাই, তা হচ্ছে মায়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)। প্রতিটি জীবই ভগবানের নিত্যদাস; তাই কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। বিশ্বস্ত সেবক যেমন তার প্রভুর কৃপায়, তার যে-কোন বাসনা চরিতার্থ করতে পারে, ঠিক তেমনই যাঁরা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের আর স্বতন্ত্রভাবে কোন বাসনা থাকে না। নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলেই, তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়ে যায়। শিব আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনি যে স্তুতিগান করেছেন, কেবল তা কীর্তন করার ফলে যে-কোন ভক্ত অনায়াসে সফল হতে পারেন।

শ্লোক ৭৮

ইদং যঃ কল্য উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্যো মুচ্যতে কর্মবন্ধনৈঃ ॥ ৭৮ ॥

ইদম্—এই প্রার্থনা; **যঃ**—যে ভক্ত; **কল্যে**—প্রাতঃকালে; **উত্থায়**—শয্যাত্যাগ করার পর; **প্রাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে; **অন্বিতঃ**—মগ্ন হয়ে; **শৃণুয়াৎ**—কীর্তন করেন এবং শ্রবণ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—এবং অন্যদের শোনান; **মর্ত্যঃ**—এই প্রকার মানুষ; **মুচ্যতে**—মুক্ত হন; **কর্ম-বন্ধনৈঃ**—সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

যে ভক্ত খুব সকালে উঠে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এই রুদ্রগীত গান করেন এবং অন্যদের তা শোনান, তিনি নিশ্চিতভাবে সকাম কর্মের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

মুক্তির অর্থ হচ্ছে সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/১০/৬) বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপম্* । মুক্তি মানে হচ্ছে অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, নিজের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। বদ্ধ অবস্থায় আমরা একের পর এক সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাকে বলা হয় *কর্মবন্ধন* । যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন সকাম কর্মে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ আমরা সুখভোগের জন্য নানা প্রকার পরিকল্পনা করি। কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা ভিন্ন, কারণ ভক্তিযোগের অর্থ হচ্ছে পরম ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে কার্য করা। আমরা যখন পরম ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে কার্য করি, তখন আমরা সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হই না। যেমন, অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন কারণ পরমেশ্বর ভগবান তা চেয়েছিলেন; তাই সেই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। ভগবদ্ভক্তিতে শ্রবণ এবং কীর্তনও দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করারই মতো। প্রকৃতপক্ষে শ্রবণ এবং কীর্তনও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়গুলি যখন জড় সুখ-ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের প্রসন্নতা-বিধানের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

শ্লোক ৭৯

গীতং ময়েদং নরদেবনন্দনাঃ
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ স্তবম্ ।
জপন্ত একাগ্রধিয়স্তপো মহৎ
চরধ্বমন্তে তত আপ্স্যথেপ্সিতম্ ॥ ৭৯ ॥

গীতম্—গীত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নরদেব-নন্দনাঃ**—হে রাজপুত্রগণ; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **পুংসঃ**—ভগবান; **পরম-আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মা; **স্তবম্**—প্রার্থনা; **জপন্তঃ**—জপ করে; **এক-অগ্র**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **মহৎ**—মহান; **চরধ্বম্**—তোমরা অভ্যাস কর; **অন্তে**—অন্তে; **ততঃ**—তার পর; **আপ্স্যথ**—প্রাপ্ত হবে; **ঈপ্সিতম্**—বাঞ্ছিত ফল।

অনুবাদ

হে রাজপুত্রগণ! আমি যে স্তোত্রটি গাইলাম, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এই স্তোত্র তোমরা জপ কর, কারণ তা মহান তপস্যারই মতো কার্যকরী। এইভাবে যখন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, তখন তোমাদের জীবন সার্থক হবে, এবং তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে থাকি, তা হলে যথাসময়ে আমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'রুদ্রগীত কীর্তন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।